Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 228020299

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 228020299

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা তুজ জোহরা, আইডিঃ 228020299 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফাতেমা তুজ জোহরা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ফাতেমা তুজ জোহরা

আইডিঃ 228020299

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.মিশনারি কারা? 6

২.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ও অপতৎপরতা..7

৩. মিশনারীদের প্রচারিত বিভ্রান্তিকর লিফলেট ও বই পত্রের জবাব...............................51

৪.খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধে আমাদের করণীয়.......................................67

তথ্যসূত্র 73

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পৃথিবীর বুকে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়ার উষালগ্ন থেকেই ইসলামের শত্রুরা নিজ নিজ জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের বিরুদ্ধে দিবা-রাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, যাতে তাদেরকে হিদায়াতের আলো থেকে বের করে ভ্রষ্টতার গভীর অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে।তারা চায় ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করতে এবং ইসলামী শক্তির প্রভাব মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দিতে। তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ﴾ [البقرة: ١٠٩]

“তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশতঃ আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরিয়ে পাওয়ার আকাঙ্খা করে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ ١٠٠﴾ [آل عمران: ١٠٠]

“হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০০]

ইসলামের প্রধান শত্রুদের মধ্যে অন্যতম হলো মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান জাতি। তারা সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার প্রতিরোধের জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে চলেছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে দুর্বল করা এবং দ্বীন ইসলামের প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া, এসবের মাধ্যমে তারা মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত। তাদের এসব মিশনারী কার্যক্রমকে তারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ‘তাবশীর’ বা সুসংবাদ’ নামকরণ করেছে। বস্তুত তাদের এসব কার্যক্রম তো মূর্তিপূজার প্রতিই আহ্বান, যা বিকৃত খ্রিস্টবাদ। যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। আর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।এ সব খ্রিস্টান তাদের এসব দুঃস্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অজস্র অর্থ

ও শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছে; এসব দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো বিশ্বকে খ্রিস্টান বানানো, বিশেষ করে মুসলিমদেরকে; কিন্তু তাদের অবস্থা তো ঐরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ٣٦﴾ [الانفال: ٣٦]

"আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের পরিতাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফুরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৬

১.মিশনারি কারা?

খ্রিস্টান মিশনারি বলতে মূলত তাদের বোঝায় যারা যীশুর শিক্ষা ও খ্রিস্ট ধর্মের বাণী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে। আপাতদৃষ্টিতে মিশনারিরা সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকে। তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষায় নিজেদের মানিয়ে নিয়ে স্থানীয়দের সাথে মিশে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করে।

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তার তেরতম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃষ্টান মিশনারিদের অতীত সফলতাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া।

চলতি শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে তাদের কি কি অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কি পরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারি এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে।

আমেরিকার অরজিনা ভার্সিটির খৃষ্টান প্রফেসর ডক্টর ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তর গবেষণা-পর্যালোচনা করার পর মন্তব্য করেছেন –

"নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃষ্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে, আবার হতে পারে চিন্তানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে। খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন – শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। ডক্টর বেরিয়েট আরো বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহকে 'আলিফ' ও 'বা' – এই দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

"'আলিফ' দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য, যেগুলোতে খৃষ্টধর্মের আওয়াজ বিলকুল পৌঁছেনি। আর 'বা' দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য, যেগুলো খৃষ্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহে অনতিবিলম্বে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভৌগলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমানে নাস্তিক বা স্রস্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পৃথিবীতে ১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা। [১]

২.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ও অপতৎপরতা

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ্ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে

আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করলো।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে।

- ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর,

রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা ? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

২.১ Board of Directors এর প্রস্তাব

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, "প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন
হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।" (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান)

বর্তমানে এটাই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

এখন আমরা মুফতি জুবায়ের আহমেদের লেখা একটি আর্টিকেল থেকে বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মকান্ড, গির্জার সফলতা ও অন্যান্য সংস্থার কারগুজারী ধারাবাহিক উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ। যা দ্বারা অনুমান করা সহজ হবে যে, বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২ যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছে

অসহায়, নিরক্ষর মানুষকে সেবা দেওয়ার নামে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যে সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাচ্ছে তার মধ্যে কিছু হলো –

(১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা, (১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি, (১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

২.৩ এনজিওদের কার্যক্রম

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় "চার্চ অফ বাংলাদেশ" নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও "মৌলবাদী এনজিও", ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতির্ষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

সি. সি. ডি. ভি.

"সি. সি. ডি. ভি." নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর "ডি.আর. আর. এস." এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। টাকা আনে মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

২.৪ পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি

এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু "পাঙন" সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫ % হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

মুসলমানের সন্তান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিনে না, মেরী ও যীশুকে চিনে !

বারিধারা নতুন বাজারের পিছনে একটি বড় বস্তি আছে। একদিন বিকালে বন্ধুবর মাওলানা মুজিব সাহেবসহ ঐ এলাকায় ঘুরছিলাম। চোখের সামনে পড়লো একটি স্কুল, সাথে গির্জা। স্কুলটি দেখে আমাদের কৌতূহল হলো।

স্কুলের সামনে ১০ / ১২ বছর বয়সের কয়েকটি ছেলে খেলাধুলা করছে। একজনকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে "রাকিবুল ইসলাম" বলে উত্তর দিলো এবং এও জানতে পারলাম যে, সে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। তাকে কালেমা জিজ্ঞাসা করলে "পারি না" বলে উত্তর দেয়। এবার আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললো "জানি না"। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মেরী বা যীশুকে চেনো ? সে উত্তর দিলো – হ্যা, চিনি। আবার জিজ্ঞাসা করলাম – কিভাবে চেনো। সে বললো, আমাদের স্যার আমাদের শিখিয়েছেন।

দেখুন, আমাদের উদাসীনতার সুযোগে আমাদের সন্তানদেরকে তারা খৃষ্টান বানাচ্ছে। এটাই হলো তাদের সেবার আসল রূপ।

২.৫ মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে

পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে তাদের সেবার ছদ্মাবরণে বহুরূপী কর্মকাণ্ড দেখে সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে – "খৃষ্টধর্ম কি আসলেই কোন ঐশী ধর্ম ?"

তা যদি ঐশীই হয়, তাহলে মিশনারিদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে কেন এতো ব্যাপক কৃত্রিমতা, জালিয়াতি, অপপ্রচার ও প্রলোভন ? বর্তমানে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি তথা পাপ মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারাই আড়াই শতাব্দী আগে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে বর্তমান খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যেই ব্যক্তি স্বার্থ, বর্ণবাদের উন্মত্ততা, নৈতিক অধঃপতন তথা অনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। খৃষ্টবাদের প্রচারকগণ এদেশেও তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে নানা সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ তাই প্রতিটি সচেতন ধার্মিক ব্যক্তির তাদের এই অশুভ ও মানবতাবিরোধী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। আসুন তাদের রূপ উদঘাটন করি।

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ

বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের

পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক

যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম

বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশী মিশনারি ক্রুসেডার (ধর্ম যোদ্ধার) শিকার মুসলিম বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলেছে চার্চ ও বিভিন্ন ছদ্মবেশী সেবা, শিক্ষা ও আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠান "এনজিও" সমূহ।

সরাসরি মিশনারির মধ্যে "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" এমন একটি সংস্থা, যার কাজ হলো ধর্মের অসারতা প্রমাণ ও ইসলামের নবজাগরণকে প্রতিহত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী বই এদেশে বহু কথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাট্যকর্মী, কণ্ঠশিল্পী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" ২০০০ অ্যালুমনই (সদস্য) নিয়ে ৫ টি মহাদেশের ৭০ টি প্রদেশে ১,০০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ প্রচারকরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের ইয়াং খৃষ্টান ওয়ার্কস এবং এভরী হোম কান্ট্রাস্ট, খৃষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপম্যান্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি.) ইয়াং ম্যানস খৃষ্টান এসোসিয়েশন (ওয়াই. এম. সি.) উল্লেখযোগ্য। তারা বাংলাদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংস্থা স্থাপন করেছে। যেমন –

* নুর-ই-ইলাহী, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* খোদার পথ, পোস্টবক্স নং ৫৮, ঢাকা – ১০০০,

* মাসীহী জামাত, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* আল হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট,

* ডাকযোগে বাইবেল শিক্ষার জন্য পোস্টবক্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৭ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংরক্ষণ ও প্রচারে ব্যবহৃত হয় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কম্পিউটার সেট। তাছাড়া ৩৪০০ রেডিও ও টেলিফোন সেন্টার খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। দেশে বর্তমানে "ঈমানের পথ" নামে ইসলামী আঙ্গিকে রেডিও অনুষ্ঠান চালু করেছে।

প্রকাশনা বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ "কিতাবুল মুকাদ্দাস" আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং "স্বর্গমত ম্যাগাজিন" উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনায় অপকৌশল ,ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম

পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. "নতুন নিয়ম", ২. "পুরাতন নিয়ম") পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে "মসীহী জামাত" নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে "পুরাতন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব" এবং "নতুন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "ইঞ্জিল শরীফ"। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্তাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শিষ্য (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় "পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা" এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমাতুল্লাহ'র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি ?

তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য ১৯৬৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

এ সকল এলাকায় তারা সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। আর হবেই না কেন ? তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিশাল অর্থের যোগান। ১৯৯৭ সালে খ্রিস্টবাদের প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল ২১২৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।

প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল

নকল ইমাম তৈরি

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল

উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে “জবাজ” নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইসলামী নাম ধারণ

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

যুবতী প্রচারক

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

২.৬ সাঁওতাল ভাইদের কি খবর ?

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক বেশীরভাগ বসবাস করে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলে।

পীরগঞ্জ থানার একটি পল্লীর কথা আলোচনা করবো, এই তথ্যটি “ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া” ৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা সাঁওতাল উপজাতির একটি দরিদ্র পল্লী। এ অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উপজাতি পল্লী আছে। যেমন – চৈত্রকল (মাহেলিপাড়া), খালিসা (মিশনপাড়া), বসুদেবপুর (ডুমারপাড়া), অনন্তরামপুর, দুর্গাপুর, উধলাপাড়া, পৈত্রীপাড়া, কাদিরাবাদ, মুনাইল ইত্যাদি।

এরা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাঁওতাল, বুনো, উড়াও ও পৈত্রী ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এদের পেশারও ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বাঁশ-বেতের কাজ করে, কেউ করে কৃষি কাজ। এদের কারো স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই। মুসলমান পাড়ায় গতর খেটে এবং বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির। আলোচিত পল্লী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার "চৈত্রকল ইউনিয়নে" অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা সবাই নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

ক্ষুধা এদের নিত্যদিনের সাথী, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন, দারিদ্রের নির্মম ক্ষতচিহ্ন এদের চেহারায়। বঞ্চনাকে ওরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে ওরা ভাগ্যলিপি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই এর জন্য ওদের কারো প্রতি ক্ষোভ ও খেদ নেই। আছে শুধু জীবনের অচল চাকা একভাবে চালিয়ে নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য হয়তো তারা মদ ও নেশা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সভ্যতার আলো আজও ঐ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেনি। তারা এখনো আদিম প্রথায় জীবন চালায়। শিক্ষা, চিকিৎসা এ অন্ধকার পল্লী থেকে নির্বাসিত।

তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সীমিত। বছরে একবার তারা ডালপূজা করে। অর্থাৎ গাছের একটি ডাল আসরের মধ্যভাগে পুঁতে তাকে ঘিরে সারারাত নারী-পুরুষ কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। কৃষি মওসুমে যখন কাজ থাকে, তখন তারা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকদের বাড়িতে মজুরী খাটে। যখন কাজ থাকে না, আকালের সময় বনে জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের পাতা ও বনজ আলু কুড়িয়ে আনে। হলুদ মরিচ মসলা ছাড়া শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে আলু দিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে। শীতের সময় এসব মানব সন্তানরা শীত নিবারণের জন্য আদিম প্রথায় উঁচু করে মাচা বাঁধে আর নিচে আগুন জ্বালিয়ে বসে রাত কাটায়। রংপুর, পীরগঞ্জ অঞ্চলে ছয় মাস পর্যন্ত আকাল থাকে। তখন তাদের কাজ থাকে না। আবার যারা বাঁশ-বেতের কাজ করে, তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে না। তখন জীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেয়ে-চিন্তে ধার-কর্জ করে চলতেও তারা অভ্যস্ত নয়। অভাবের সময় এসব দরিদ্র পল্লীতে সরকারী- বেসরকারী পর্যায় ঋণদানেরও কোন প্রথা চালু নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র রংপুর জেলার চৈত্রকল ইউনিয়নের। সেখানকার ছাব্বিশটি পরিবার প্রায় সবাই ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। চৈত্রকলস্থ "খলিশা মিশন" এ বিষয়ে অগ্রণী

ভুমিকা পালন করে চলেছে। পল্লীর নিভৃতকোণে নীরব বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত খালিশা মিশনে স্থায়ীভাবে বহুলোক কর্মরত আছেন। এ মিশনে আছে চিকিৎসা সেবা ও দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ।

মাহেলী পাড়ার জনসংখ্যা প্রায় দুইশত। ওখানে সদ্য নির্মিত হয়েছে মনোরম একটি গির্জা। এর তত্ত্বাবধান করেন লুইস দুখু। তাকে প্রশ্ন করা হলো, উপজাতি সম্প্রদায় এদেশের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির অঙ্গ। এ ঐতিহ্য-চ্যুতির কারণ কি ? উত্তরে তিনি জানান, আমরা অবহেলিত সম্প্রদায়। আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। খৃষ্টানরা আমাদের কাছে আসে, তারা আমাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাদের আদর-যত্ন আমাদের আকৃষ্ট করছে। খৃষ্টানরা কোন বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, কই, তারাও তো কোন সাহায্য করছে না।

উধলাপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধা নৌরি, স্বামী রামধন। তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, জীবন কেমন চলছে ? উত্তরে তিনি বললেন, কষ্ট করে চলি। সেখানকার উপজাতিদের দারিদ্র্য বিমোচনের কোন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। এ দরিদ্র পল্লী আগে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই আছে। হওয়ার মাঝে হয়েছে শুধু উপজাতির ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্তি। সুচতুর খৃষ্টানরা হয়তো জানে, কোন জাতি ও সম্প্রদায়কে ছলে-বলে, কৌশলে একবার ধর্মান্তরিত করতে পারলে তাদের প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ সাময়িক। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে – তারা খৃষ্টানের ঘরে খৃষ্টান।

এ তো হলো একটি ইউনিয়নের প্রতিবেদন, এ ছাড়া কতো ইউনিয়ন গ্রাম রয়েছে, সেখানে যারা এদের মতো বা এদের চেয়ে বেশী আমাদের কাছে সর্বদা অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, যা ছিল আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও ঈমানি ফরিযা। পাশে না দাঁড়ানোর ফলে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের পাশে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। উচিৎ তো ছিল আমরা তাদের খোঁজ খবর নিবো।

উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিবেদিত প্রাণ এসব হতদরিদ্র আদম সন্তানদের খোঁজ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি এ দায়িত্ব পালন করছি ? অথচ প্রতিবেশীর সেবা ও খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীর কর্তব্য পালনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন – "যে ব্যক্তি পেটপুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত পোহায়, সে আমার উম্মত নয়।" অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – "আল্লাহ'র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ কোন ব্যক্তি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশীর সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ নয়।" এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবেশী যে পরিচয়েই হোক, তার প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ মহান কর্তব্যটুকু আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো বিধায় দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

বড় আফসোস! আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের হতভাগা অংশ, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি বিচ্যুত হয়েছি। সেজন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনা। এখানে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় – আজ আমরা যাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখছি, যাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্যবোধ আছে বলে মনে করছি না। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এসব অবহেলিত সম্প্রদায় একটি বৃহৎ জাতিতে রূপ নিবে। তারা প্রশিক্ষিত হবে, আর অতীত বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের দায়ী করবে। স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লেবানন। সেখানে খৃষ্টানরা স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি এই আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি ? ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। আমরা কি তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিনি ? এখনো সময় আছে তাদের পাশে দাঁড়াবার। এখনো সময় আছে তাদের আমানত পৌঁছানোর। আসুন, আজ থেকে আমরা তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেই। যা ছিল আমার আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নাত।

২.৭ একটি পরিসংখ্যান

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন মূল দাবী হলেও তাদের কোন কোন এনজিও এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে খৃষ্টান মিশনারির "ধর্মান্তর কর্মসূচি" প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ধর্মান্তরের প্রধান টার্গেট বানায়। খৃষ্টান মিশনারি ও তাদের সহযোগী এনজিওগুলো কাজের ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয়ের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটানো। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের দেশে এনজিও ও মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। বাংলাদেশের খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে সে কথার প্রমাণ মিলে।

১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খৃষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খৃষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকায় খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা "হলি রোজারি"। ১৮৭৭ সালে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীগণ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৫২ সালে উক্ত গির্জায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৫৩ জন আর ১৯৭৬ সালে তা ৩০০০ জনে উন্নীত হয়, ১৯৮৩ সালে উপস্থিতি ৬০০০ জনে আর ১৯৯৮ সালে উপস্থিতির সংখ্যা ৫০,০০০ এ পৌঁছে।

বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংখ্যা ৮৫০। এর বাইরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি এনজিও কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার, পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লাখ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হাজার। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১০ লাখ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

৪৪ লাখ, এনজিওদের রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা ৪ কোটি। উপরোক্ত তথ্য ও সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। কিন্তু ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখানে দেখায়, বাংলাদেশে বর্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি। আর বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটির ঊর্ধ্বে। মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি একজন ১৩ জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে ? আবার, জন্মনিয়ন্ত্রণ থিওরি তাদেরই মতবাদ। যদি বলা হয়, না; তাহলে এই বাকি জনসংখ্যা এলো কোত্থেকে ? অবশ্যই এরা ধর্মান্তরিত খৃষ্টান।

২.৮ .কি হচ্ছে দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে ?

লোমান তপন, পিতা মরটিন তপন। চকবানারসি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজাতি খৃষ্টান, অর্থাৎ তিনি পূর্বে উপজাতি ছিলেন, বর্তমানে তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তিনি জানান, চকবানারসি অঞ্চলে “নিচপাড়া মিশন” এর প্রচেষ্টায় প্রায় ৫ শত পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। নিচপাড়া মিশনটি এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এটি ইটালিয়ান মিশন। এখানে দুজন ফাদার ও চারজন সিস্টার সার্বক্ষণিকভাবে মিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। এ মিশনটি বীরগঞ্জ থানার উত্তরে, প্রায় তিন মেইল ভিতরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিশাল জায়গা নিয়ে এর অফিস ভবন, গির্জা ও মিশনারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়াও মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরিদানের লোভনীয় টোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, খৃষ্টান মিশনারিগুলোতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে চাকরি মিলে না। চাকরির প্রলোভনে পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও ভিতরে ভিতরে পুরোদস্তুর খৃষ্টধর্মনিষ্ঠ। মুসলমান ছেলে-সন্তানদের খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মিশনারিগুলোতে প্রায়শই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আকর্ষণীয় কর্মসূচী পালন করা হয়। এসব কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের মুসলমান সন্তানরা নিয়মিত মিশনে যাতায়াত করছে। ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মে খৃষ্টানিজম মানসিকতা গড়ে উঠছে। (বীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে লুথারেন মিশনের প্রতিবেশী)। এ তো ছিল থানার প্রতিবেদন, তারপরেও এটি হলো আজ থেকে প্রায়

৭/৮ বছর পূর্বে। এখন একটু অনুমান করুন, এই সাত / আট বছরে পরিস্থিতি কীরূপ হতে পারে। এই অধমের জন্মও সেই বীরগঞ্জ থানায়, তাই প্রায়ই তাদের সামনাসামনি হতে হয়। এক সময় দেখতাম, আমাদের এলাকার সাঁওতালরা ধানক্ষেত ও জঙ্গল থেকে ইঁদুর ও শিয়াল ধরে খেতো আর সাধারণভাবে চলাফেরা করতো। আমরা যেহেতু তাদের কাছে যাইনি, তাদের পাশে দাড়াইনি, ফলে ভিন দেশ থেকে লাল চামড়ার লোকেরা তাদেরকে শিক্ষিত বানিয়েছে। একদিন এক সাঁওতাল ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিলো, সে গর্বের সাথে বলছিলো – আমাদের অমুক ডাক্তার খৃষ্টান, আমাদের অমুক অফিসার খৃষ্টান।

এই তো এই বছরের শুরুর দিকে একদিন বীরগঞ্জ উপজেলার শহর থেকে ভ্যানে করে বাড়িতে ফিরছিলাম। মেইন রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ছোট ছোট মাটির ঘরের এক বিস্তীর্ণ মহল্লা। মহল্লাটি সাঁওতালদের। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে মহল্লার মাঝে নতুন একটি ঘর, সেখানে কিছু ছেলে মেয়ে সারিবদ্ধভাবে হাঁটুতে ঠেক দিয়ে কি যেন বলছে, আমার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। কারণ ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দেখিনি, যদিও আমার যাতায়াত সাধারণত এ পথেই হয়ে থাকে। ভ্যানগাড়ি থামিয়ে সেখানে গেলাম আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি হচ্ছে। লোকটি উত্তরে বললো – উপাসনা হচ্ছে। আবার প্রশ্ন করলাম – কিসের উপাসনা। সে বললো – ক্যাথলিকদের উপাসনা। ক্যাথলিক ! ক্যাথলিক তো খৃষ্টান। সে বললো – আমরাও তো খৃষ্টান। আমি বললাম – আপনারা তো খৃষ্টান ছিলেন না, আপনারা তো সাঁওতাল। কতদিন আগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন ? জবাবে বললো – এই তো কয়েকদিন হলো। কেন খৃষ্টান হলেন ? বললো – তারা আমাদের ঋণ প্রদান করে, আমাদের কাছে আসে। আমি সেই লোকটিকে বুঝালাম আর ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিলাম। সে উত্তরে বললো – আপনি তো আগে আসেননি, আগে বললে আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করতাম, এখন সম্ভব না। কারণ আমাদের গোষ্ঠীর সকলেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি মুসলমান হলে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ তো ছিল সাঁওতাল বস্তির কথা। এমন আরো যে কতো মুসলিম পরিবারকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে, তা কি আমরা খবর রাখি ?

আমার বন্ধু মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে বলছিলেন, আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ কারিতাসের দাওয়াতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে তা কি খবর রাখেন ? তিনি আরো বললেন – আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এদের কয়েকজন খৃষ্টান নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে, খৃষ্টান বলে প্রকাশ করে না।

আপনিও আপনার আশেপাশে খোঁজ করলে এমন অনেক মানুষ পাবেন, যারা মিশনারিদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত। এদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ কর্তব্য পালনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের ব্রতী হওয়া আবশ্যক। নতুবা পরিণতি কি দাঁড়ায় তা বলা কঠিন।

২.৯ খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ

রমযানুল মুবারাকের শেষ দিনগুলোতে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে। আমি দুজন নওমুসলিমকে নিয়ে আমার বাড়ি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে সালাম বিনিময়ের পর বুঝতে পারলাম, ফোন করেছেন মাওলানা রায়হান সাহেব (সম্ভবত তিনি জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গির চর মাদরাসার দারুল ইকামা হোস্টেল পরিচালক)। তিনি বললেন – যুবায়ের ভাই, কয়েকদিন ধরে ফোন করছি, আপনাকে পাচ্ছি না। মাওলানা ওমর আলী সাহেবকেও পাচ্ছি না। আমি বললাম, হুজুর তো উমরার সফরে গিয়েছেন। এবার বলুন, কি খেদমত করতে পারি ? তিনি বললেন – আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ী শ্রেণীর এক ছাত্র নাজিবুর রহমান জানালো, তাদের এলাকায় খৃষ্টানরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে, আমরা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবো, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমাদেরকে খৃষ্টান হতে হবে। এলাকাবাসী উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে এই এবতেদায়ী ছাত্রের কাছে এসেছে। কারণ সে-ই ঐ এলাকার বড় হুজুর। এখন ছেলেটি এ বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। যেহেতু দীর্ঘদিন আপনারা খৃষ্টান মিশনারির তথ্য অনুসন্ধান ও তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধের সাথে জড়িত, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি ?আমি বললাম, অবশ্যই। ইন শা আল্লাহ।

আমি ঐ ছেলের নাম, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম, স্থানটি হলো দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই আমার খুব কান্না পেলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে বাস করে সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে মিথ্যার উপর ভর করা ভিত্তিহীন, বিকৃত ধর্মানুসারীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় ! এর জন্য আমরাই দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

যাই হোক, ২৮ রমযানে বাড়ি ফিরলাম, চিন্তা – ঈদের আগের দিনই যাবো। ফোনে যোগাযোগ করে ঈদের পর তৃতীয় দিন বিতর্কের তারিখ ঠিক হলো। তৃতীয় দিন সকাল সকাল আমি বীরগঞ্জ থেকে রওনা হলাম, বন্ধু সারওয়ার ও ইমরান ভাইসহ সেই অজপাড়া গাঁয়ে পৌঁছলাম।

সেই এলাকায় খৃষ্টান মিশনারি "ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা" এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে পশুপাখি কিভাবে লালন-পালন করবে তারও প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণেরই এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, তাহলে অফিসের আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদ্রাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানালো।

আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ।

এ হলো মিশনারিগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনীয় শ্লোগান। এর আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য।

২.১০ মসজিদের খতীব খৃষ্টান

২০০৯ সালে এক সফরে লালমনিরহাটের আদিতমারি থানায় যাই। সেখানে যাওয়ার পর এলাকার মানুষ জানালো যে, আমাদের এলাকায় একজন খতীব সাহেব আছেন যিনি মসজিদে জুমআর খুতবায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আপত্তিকর। তিনি বলেন, নামায পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে। খতীব সাহবে আরো বলেন, কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন ঘটবে। তখন তো তাকে মানতে হবেই। তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায় ? আরো বলেন – মাটির নিচের নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম ? যিন্দা নবী উত্তম না মৃত নবী উত্তম ইত্যাদি। আমরা যখন খতীব সাহেবের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলাম, জানা গেলো তিনি আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সক্রিয় সদস্য। আর আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট হলো খৃষ্টান মিশনারির ছদ্মবেশী একটি সংস্থা। সেবার আবরণের খৃষ্টধর্ম প্রচারই যাদের মূল লক্ষ্য। সেখানে সেকান্দার

মাস্টার নামে আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি একটি মসজিদের সভাপতি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের উপর উত্থাপিত খৃষ্টানদের শিখানো বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেগুলো দিয়ে তারা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত করে থাকে।

২.১১ ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগবান গড় গ্রামের (শৈলকূপা থানা ঝিনাইদহ) সফরের কথা বলি। এ সফরে আমাদের রাহবার ছিলেন স্থানীয় কলেজের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম ভাই। গিয়ে দেখি সেখানের অনেক মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত স্থানীয় ঠাণ্ডামাতবর, এলাহী বখশ, বাদশা মিয়া আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাদের সাথে কথাবার্তা চলছিলো। এক পর্যায়ে আমাদের আলোচনা মুনাজারার (বিতর্কের) রূপ নেয়, তবে তারা মুনাজারায় পরাজিত হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী তাদের একজন দাঈ "অমুল মাধুর্য" এর (যে ঐ এলাকায় ইয়াং সোসাইটির প্রধান) সাথে আমার খাতির জমে যায়। আমি তার দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা বই পুস্তক বিলি করি, বুঝাই আর আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে দাওয়াত দেই। আমি ফের প্রশ্ন করলাম, আপনারা বই পুস্তকের টাকা পয়সা কোথায় পান ? উত্তরে বললেন, আমরা প্রত্যেকেই আয়ের এক দশমাংশ আল্লাহ'র রাস্তায় দান করি এবং দান করার পর সেদিকে ফিরেও তাকাই না। কেউ আমাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকেও এই দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের দাওয়াতি কাজের অর্থযোগান এভাবেই হয়। আর এভাবে সংগৃহীত টাকা দিয়েই আমরা বই পুস্তক কিনি আর বিতরণ করি। আমূল মাধুর্য জানালেন, তিনি একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে মুসলমানের সন্তানরাও পড়াশুনা করে। তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা নয় বরং খৃষ্টধর্মের দীক্ষা দেওয়া হয়। সেকুলার পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। তিনি এ ধরনের বহু তথ্য দিলেন।

আমি মুসলিম ভাইদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা কয়দিন কয়টি বই আমার প্রতিবেশী অমুসলিমের হাতে তুলে দিয়েছি ? আমরা কতোভাবে আমাদের টাকা খরচ করি, একটি টাকাও কি অমুসলিম ভাইদের পিছনে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে খরচ করেছি ?

২.১১ মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ

খবর পেলাম, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানায় বহু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে, তাই ঐ অঞ্চলে সফর করি। প্রথমে মেলান্দহ জামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে সম্মানিত মুহতামিম,

মুফতি শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা উভয়ে মাদারগঞ্জ থানার তেঘুরিয়া ইউনিয়নের কয়লাকান্দি গ্রামে পৌঁছি। সেখানে মুসলমানদের এলাকায় ন্যাজরিয়ান মিশনের একটি বিশাল গির্জা দেখতে পেলাম। ঐ এলাকার অনেক মুসলমানই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার দাওয়াত দেই। অনেকে বাইবেল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস ফেরত দিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসেন এবং তাওবা করেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামান্য অনুভূতিও আমাদের হয় না।

২.১২ মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান

৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে মাদারগঞ্জের তেঘুরিয়া ইউনিয়নে আমাদের সফর হয়। সেখানে পৌছার পর স্থানীয় এক খৃষ্টান হাফেজ .... এসে আমাকে বললেন, আমাদের এখানকার প্রবীণ / মুরব্বী (যিনি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান) আপনাদের সাথে কথা বলতে চান। তখন আমি অধম, বন্ধুবর মাওলানা নুরুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি জালাল সাহেব আসন দিয়ে বসে আছেন। সামনে বিছানার উপর ছড়ানো পবিত্র কুরআন, যেন এ কোন সাধারণ বই-খাতা ! আর ডায়েরি দেখে তাতে কি যেন দাগাচ্ছেন। আমরা সালাম দিয়ে প্রথমে কুরআন শরীফটি বিছানা থেকে বুকে উঠিয়ে নিলাম। এরপর তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হলো। তার আলোচনার বিষয় ছিল মিশনারিগুলোর শিখ

িয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো। আমরা তার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে লাগলাম, তিনি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বস (খৃষ্টান মিশনারিদের প্রধান) জাহাঙ্গীর আলম ওরফে লেবু ডাক্তারকে ফোন করলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমাতুল কুরআন, কিতাবুল মুকাদ্দাস ও কিছু নোট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সাথে কিছুক্ষণ যুক্তিতর্কের পর বললাম, তর্ক কিংবা বিতর্ক কোনটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সত্যকে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আপনার প্রতি আহবান থাকবে, পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসবেন।

২.১৩ খৃষ্টান প্রচারকের সাথে বিতর্ক ও দাওয়াত

হালুয়া ঘাটের এক চার্চে ফাদারের সাথে আমরা কয়েকজন দেখা করি। প্রথমে তাকে সালাম দিলাম।

যুবায়েরঃ আসসালামু আলা মানাত্তিবাআল হুদা।

ফাদারঃ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

যুবায়েরঃ কেমন আছেন ?

ফাদারঃ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন ?

যুবায়েরঃ আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আমরা আপনাদের চার্চ দেখতে এসেছি, দেখতে পারি কি ?

ফাদারঃ হ্যা, অবশ্যই দেখতে পারেন।

যুবায়েরঃ (চার্চ দেখতে দেখতে কিছু দাওয়াত) ফাদার সাহেব, দেখুন, আমাদের সমাজে একটি বড় ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো, আমরা যখন কোন হিন্দু বা খৃষ্টান ভাইদের দেখি, তাকে বিধর্মী মনে করে তার থেকে দূরে থাকি। হিন্দু খৃষ্টান ভাইরাও তাই করে। আসলে এমন করা ঠিক নয়। আমরা সকলেই মানুষ। আপনার কপালে লেখা নেই যে, আপনি খৃষ্টান। তদ্রূপ আমার কপালেও মুসলমান লেখা নেই। আমার চামড়া কাটলে রক্ত লাল হবে, আপনার চামড়া কাটলেও তাই। এর ব্যত্যয় হবে না। মূলত এই পার্থক্য আমরা নিজেরাই করে নিয়েছি। আমাদের মালিক কোন পার্থক্য করেননি। আমাদের প্রভু আল্লাহ সকলকে লক্ষ্য করে বলেন – “হে মানুষ সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ......” এখানে মালিক কোন ভাগ করেননি। এই মালিক এক, তার সাথে কোন শরীক নেই।

ফাদারঃ হ্যা, হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাইবেলেও তা আছে।

যুবায়েরঃ আচ্ছা, আপনার কাছে অনেক কিছু জানা যাবে। আমি জানতে চাই, বাইবেল কি আল্লাহ’র কিতাব ?

ফাদারঃ হ্যা, এটা আল্লাহ’র কিতাব। আপনাদের কিতাবে যাকে তাওরাত, ইনজিল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যুবায়েরঃ বলুন তো, মানুষের লেখা চিঠি কি আল্লাহ'র কালাম হতে পারে ?

ফাদারঃ না, কখনো হতে পারে না।

যুবায়েরঃ আপনার দাবী অনুযায়ী মানুষের কথা আল্লাহ'র কিতাবে স্থান পেতে পারে না, অথচ নতুন নিয়মের ২৭ অধ্যায়ের মধ্যে ১৪ টি অধ্যায় হলো সেন্ট পোলের চিঠি। আর সেন্ট পোল যীশুকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার অনেক পরে এসেছেন। সুতরাং তার চিঠিগুলো আল্লাহ'র কালাম হতে পারে না। প্রশ্ন জাগে, তা কিভাবে আপনাদের বাইবেলে স্থান পেলো!

ফাদারঃ উনি তো পবিত্র আত্মার সাহায্যে লিখেছেন।

যুবায়েরঃ যীশু তো বাংলাদেশীদের জন্য নবী নন। কারণ বাইবেলের মথির ২৪:১৫ তে আছে, যীশু বলেন – "আমি তো শুধু বনী ইস্রাইলের হারানো মেষদের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" আর আমরা বাংলাদেশীরা বনী ইস্রাইলের লোক নই।

ফাদারঃ আমি এখন বলতে পারবো না, পরে আরো পড়াশোনা করে আপনাকে জানাবো।

যুবায়েরঃ দেখুন, আমাদের মাঝে আরেকটি ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো – হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাদের নবী ? যদিও আপনারা তাকে মুসলমানদের নবী আর আমরা আমাদের নবী বলি। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে – তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। সুতরাং কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। তাই আপনাকে আহবান করবো তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনবেন এবং কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী আমল করবেন।

ফাদারঃ আমার অনেক ইচ্ছা যে, কুরআন শরীফ পড়বো। একবার কুরআন শরীফ কিনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খৃষ্টান হওয়ায় আমার কাছে কুরআন শরীফ বিক্রি করেনি।

যুবায়েরঃ আমি আপনার কাছে একটি কুরআন শরীফ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ। আজকে আসি। আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশে খৃষ্টানদের ৬ টি ধর্মপ্রদেশ

বাংলাদেশে খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে পুরো দেশকে ৬ টি প্রদেশে বিভক্ত করেছে। যথা – (১) দিনাজপুর, (২) রাজশাহী, (৩) খুলনা, (৪) চট্টগ্রাম, (৫) ঢাকা, (৬) ময়মনসিংহ।

নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য

দৈনিক করতোয়ার ২১ এপ্রিল ২০০৮ এর একটি সংবাদ এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো –

জলঢাকা প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খুটামারা, কৈমারী, বালাগ্রাম, মীরগঞ্জ, শিমুলবাড়ী, কিশোরগঞ্জের পুটিমারী ও বড়ভিটার হিন্দুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। মেগা ফেলোশিপ চার্চ ও ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চসহ ৫ টি সংগঠন নগদ অর্থ, চাল, ডাল, শিক্ষা সহায়তা ও ঋণ প্রদানসহ আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রমের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার কাজ জোরে-শোরে চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এলাকাজুড়ে অফিস, উপাসনালয় ও শিশুদের জন্য স্কুল। শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তরালে স্কুলগুলোতে চালানো হয় বিভিন্ন সভা ও সমাবেশ। আর প্রোগ্রামের মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলে। ওমেগা ফেলোশীপ চার্চ এনজিওর নামে গ্রামের অভাবী লোকদেরকে অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার কথা বলে তাদের তৈরি স্কুল ও অফিসগুলোতে নিয়ে তাদেরকে খৃষ্টান বানানো হচ্ছে। গত ১৬ এপ্রিল খুটামারা ইউনিয়নের ২০ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ; পুটিমারী, কচুকাটা ও পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ১৮ জন; বড় ভিটা ও কৈমারী ইউনিয়নের ১০ জন মহিলা ও পুরুষের অভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওমেগা ফেলোশীপ চার্চের কথা বলে দিনাজপুর, বীরগঞ্জ উপজেলার ৭ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের মিশন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সেখানে গিয়ে খৃষ্টান বানানোর কথা জানতে পারার পর এলাকার মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। পরে ঐ ইউপির চেয়ারম্যান গোপাল চন্দ্র দেব শর্মা তাদেরকে উদ্ধার করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বীরগঞ্জ থানার ওসি জানান, গত ১৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট প্রতারকদের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা হলো – খুটামারা ইউনিয়নের খালিশা, খুটামারা গ্রামের টনে মামুদের স্ত্রী শাহী, টাটারি স্ত্রী ছারা, শাহারা, সুলতানের স্ত্রী আকলী, রবিউলের স্ত্রী নার্গিস, মৃত কলেজের স্ত্রী অহেদা, লবদ্দিনের স্ত্রী হাওয়া, বিশাদুর স্ত্রী হাওয়াতোন, বকশের

স্ত্রী মজিলা, ওসমানের স্ত্রী আসমা, রশিদুলের স্ত্রী ক্যান্টি, ভালের স্ত্রী এপাতন, মৃত টোলার স্ত্রী রহিমা বেগম ও পাদুরার ছেলে লবদ্দিন, মৃত জমালার ছেলে রমজান (ভালে)।

৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

নয়া দিগন্তের ২৭ মে ২০১০ ইং তারিখের একটি পেপার কাটিং এখানে তুলে ধরা হলোঃ

সাইফুল মাহমুদ, ময়মনসিংহ প্রতিনিধিঃ .... প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদানের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতার সহায়তায় একজন বিদেশী ধর্মযাজকসহ তিন ধর্মযাজক ও তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালককে আটক করে পুলিশ। এ সময় ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সবাই জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।

উদ্ধারকৃত নারী ও পুরুষেরা জানান, সরিষাবাড়ী উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের আবদুল বারেকের পুত্র রফিকুল, মাজারিয়া গ্রামের রফিক (পিতা – অজ্ঞাত) ও কাশেমের পুত্র রিপন এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার বাসনিয়োগী গ্রামের আসেক আলীর পুত্র শামসু, তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়ার কথা বলে। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের বলা হচ্ছে যে, ঋণ নেওয়ার জন্য সবাইকে ময়মনসিংহে যেতে হবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে তাদের সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা এলাকায় জড়ো করা হয়। সেখান থেকে তাদের একটি বাসযোগে ময়মনসিংহে নিয়ে আসা হয়। দুপুর নাগাদ বাসটি শহরের ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রিজের কাছে পৌঁছে। এখানে একজন বিদেশীসহ তিন ব্যক্তি তাদের বাস থেকে নামিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নিয়ে যান। এদের মধ্যে কয়েকজনকে নদের পানিতে গোসল করায় আর তাদের জিজ্ঞেস করে – তোমরা কি যীশুকে বিশ্বাস করো ? এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই জানতে চান, ঋণ নিতে হলে যীশুকে বিশ্বাস করতে হবে কেন ? তখন শামসু তাদেরকে চুপ থাকার কথা বলে ধমক দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কেউ পিছু হটতে থাকে। এ সময় নদের তীরে একজন মওলানাকে দেখে ঋণ প্রত্যাশীরা জানতে চান, ঋণ নেওয়ার সাথে যীশুকে বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি ? তখন হুজুর তাদের কথা শুনে বিষয়টি বুঝতে পারেন আর স্থানীয় লোকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। এ সময় বেশ কিছু লোক জড়ো হয়। তারা বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলে কোতোয়ালী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইউনাইটেড পেন্টিকেস্টল চার্চ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান

ধর্মযাজক) ফাদার রেভা সমর সাংমা ও ফাদার রেভা প্রদীপ সাংমাসহ তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালক শামসু ও রফিকুলকে আটক করে। এ সময় ৩৫ নারী ও ২০ পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। তাদের সাথে ১৫ শিশুও রয়েছে। তারা সবাই মুসলিম দরিদ্র পরিবারের লোক।

এ দিকে ইউনাইটেড পেন্টি কেস্টল চার্চ অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) আমেরিকান নাগরিক ফাদার রেভা জেমস অরভিন নয়াদিগন্তকে জানান, আমরা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করি না। আমাদের কোন এনজিও নেই। আমরা কাউকে ঋণ প্রদানও করি না, আমরা তাদেরকে টাকা দেওয়ার কথাও বলিনি। তবে তিনি আগতদের কাছে জানতে চান, তারা যীশুকে বিশ্বাস করে কিনা, তার ব্যাপটিস্ট তরীকা কিনা। তখন জবাবে তারা বলেছেন, হ্যা, এ কথা বলার পরই তাদের গোসল করতে বলা হয়। কেন গোসল করতে বলা হলো ? এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি তিনি। তিনি বাংলায় আরো বলেন, আমার মন খুব খারাপ। ওরা অ্যাকশন নিবে, এসব আমার অপছন্দ।

খৃষ্টান মিশনারিরা ছলচাতুরি করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে করে যাচ্ছে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের কয়েকজন

(১) ড. উইলিয়াম কেরীঃ তিনি পি.এইচ.ডি. হোল্ডার। তিনি পশ্চিম বাংলায় কৃষি কাজ করেছেন। তার ভাষা ইংরেজি, তিনি এদেশে এসে বাংলা ভাষা শিখেন। তিনি দেখলেন, বাংলা ভাষা কোন সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। এটাকে ইংরেজি ভাষার সাথে মিলিয়ে একই ফর্মে একটি উন্নত ভাষা করা যায়। তিনি বহু বছর সাধনা করে এ বাংলাকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করেন। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে তার অবদান অনস্বীকার্য। তারপর তিনি কলকাতায় সুপিরিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হোন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রচার। তখন বাংলা বর্ণের কোন ছাপাখানা ভারতবর্ষে ছিল না। তিনি ইংল্যান্ডে অর্ডার দিয়ে বাংলা বর্ণের ছাপামেশিন নিয়ে আসেন আর বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপান। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজি বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করে ভারতবাসীর মধ্যে বিলি করেন। এমন ত্যাগ যদি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে থাকতো, তাহলে আমাদের এতো দুর্দশায় পড়তে হতো না।

(২) মাদার তেরেসাঃ তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় তার প্রতিষ্ঠিত ৩০০ এতিমখানা রয়েছে। মাদার তেরেসার এক বড় টার্গেট ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা।

এ ছাড়াও ড. টমাস, ফাদার টর্সবার্লার, টর্বেন্ডে পিটারসন, আলফ্রেড বরীন মণ্ডল, ড. অলসন – খৃষ্টান মিশনারির এ সকল নেতারা বছরের পর বছর ধরে বাংলার এ দুর্গম পাহাড়ের ভিতরে জীবন যাপন করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। আমরা ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামকে ধর্ম প্রচারের জন্য যেভাবে নিবেদিত পেয়েছি, এই খৃষ্টান নেতাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ তার চেয়ে খুব বেশী না হলেও কম ছিল না। আমাদের ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের ঐতিহ্য খৃষ্টানরা নিয়ে গেছে।

সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি ?

পৃথিবীর পথে-ঘাটে পড়ে থাকা শিশুদের আর রাস্তার ধারে অবহেলিত জারজ সন্তানদের তারা পিকাপে করে নিয়ে যায় তাদের সেন্টারে। এ শিশুদের মেধাবীদেরকে তারা শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে ডাক্তার, পাইলট, সেনাবাহিনী ইত্যাদি বানায়। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বাঁধলে এদেরকে ব্যবহার করে। যেমন বর্তমানে আফগান, ইরাকে যুদ্ধরত বহু আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য মারা পড়ছে কিন্তু এদের অনেকের জন্য চোখের পানি ফেলার মতো কোন আপনজন পাওয়া যায় না, কারণ এদের অধিকাংশই পথের ধারের অবহেলিত পরিচয়হীন জারজ সন্তান।

মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে তাদের টার্গেট

খৃষ্টান মিশনারি প্রেরক সমিতির সভাপতি বলেন, খৃষ্টান মিশনারিদের বড় উদ্দেশ্য, যে সব ছাত্র আমাদের স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপন করে বের হচ্ছে, তাদের মন মস্তিষ্ক আমাদের ধাঁচে গড়ে তোলা। (আপনি ঢাকায় বা বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে দেখবেন একটি স্কুলে ছাত্র দেওয়ার চেয়ে অভিভাবকরা বেশী খুশী হোন মিশন বা গির্জা স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করতে পেরে। কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে, ইংরেজি বলতে পারবে, স্মার্ট হবে, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সুযোগ পাবে, বহির্বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারবে।) তিনি বলেছেন, কোন গির্জা স্কুলে যদি কোন মুসলমান ছেলে পড়ে তাহলে আমাদের লাভ। কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। জুমআয় যাবে, ঈদের নামায পড়বে, মা-বাবা মারা গেলে জানাযায় যাবে কিন্তু মন-মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ইসলাম বিমুখ হবে। ইসলামের পক্ষে সে কথা বলবে না। বরং সে নিজের অজ্ঞাতে আমাদের মিশনারিগুলোর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের কথার প্রতিফলনের বহু নমুনা দেখা যাচ্ছে।

আপনি দেখবেন, পৃথিবীর যেখানে খৃষ্টান মিশনারিগুলোর স্কুল আছে, সেখানে গির্জাও আছে। গির্জা ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও তাদের স্কুল কলেজ গড়ে উঠেনি, এমনকি লন্ডন ইউনিভার্সিটিও না। তার পাশে রয়েছে ভেস্টওয়ান খ্রিস্টিয়ান চার্চ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা যদি যদি কোন স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটির পাশে মসজিদ বানাতে চাই, তখন আমাদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করা হয়। আপনি নটরডেমে যান কিংবা মোহাম্মদপুরে আসাদগেট

মিশনারি স্কুলে, সাথেই গির্জা দেখতে পাবেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের স্কুলে যদি তাকে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আমাদের মিশনারির বিপক্ষে একটি টু শব্দও করবে না।

মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে যা শিক্ষা দেওয়া হয়

দৈনিক নয়া দিগন্তের এক রিপোর্ট অনুযায়ী নীলফামারীতে আরো পাঁচটি সংগঠন রয়েছে, যারা ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খৃষ্টের বই, যীশু খৃষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ায়। ছোটদেরকে "সিবগাতুল্লাহ" নামের একটি বই পড়ানো হয় যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হয়। সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্টের একটি স্কুলে ছোট ছোট ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে "ইটালি ডে জারি"র লেখা "আমার বাইবেলের বন্ধুগণ" পড়ানো হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মিশনারি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের উক্তি

হালুয়াঘাটে সফরকালে এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো। তিনি বলেন, আমার ছেলে মিশনারি স্কুলে বাইবেলও পড়ে। কথাটা খুব গর্বের সাথে বলছিলেন।

সমিতির মাধ্যমে প্রচার

খৃষ্টান মিশনারিগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে পুরুষ-মহিলাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছে। আর সেই সমিতির সদস্যদের পড়ানো হচ্ছে বাইবেল, বিভিন্ন সিডি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যীশুখৃষ্টের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র। তাদেরকে পড়ানো হয় ইনজিল শরীফ, মানে বাইবেল। লুকের লেখা "হযরত ঈসা মসীহ" আর "মুসলমান ও হিন্দুরা ১০০ ভাগ জাহান্নামী আর খৃষ্টানরা ১০০ ভাগ জান্নাতি" সহ আরো কতো বিচিত্র বই। রাতের আঁধারে শিশু ও মহিলাদের দেখানো হয় বিভিন্ন সিডি।

"আগাবে" নামক একটি সমিতিতে সপ্তাহে ২ টাকা জমা নেওয়া হয় এ বলে যে, যখন এক হাজার টাকা জমা হবে, তখন তাদেরকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ রকম লোভ দেখিয়ে তারা দরিদ্রদের হাত করছে। একজনকে ১৮ হাজার টাকার চাকরি দেওয়া হবে বলে খৃষ্টান বানিয়েছে। ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চ ও খৃষ্টান লাইফ অফ বাংলাদেশ (সি.এল.বি.) 'র ইউনিয়ন ইনচার্জ নতুন রায়ের ভাষ্যমতে, ১২ ই জুন ৪৫ জন মুসলমান ও ১৩ ই জুন ৫৬ জন হিন্দুকে শিশাতলী গির্জায় নিয়ে খৃষ্টান বানানো হয়েছে।

নীলফামারী জেলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার

নীলফামারী জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে ৩০০ গজ দূরে উকিলপাড়ায় অবস্থিত ইউনাইটেড পেন্টিকস্টাল চার্চ অফ বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ

চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনটির আঞ্চলিক সমন্বয়ক প্রফুল্ল কুমারের দেওয়া তথ্যমতে শুধুমাত্র গত এক বছরে এই জেলাতেই ৫৩৬ জন হিন্দু ও ৪৫ জন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান বানানো হয়েছে। কেউ যদি ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ঢাকার বাইবেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ে তার চাকরি ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

নেত্রকোনা জেলায় ধর্মপ্রচার

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরসহ বিভিন্ন এলাকার গারোদের খৃষ্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে। নজরুল ইসলাম নামক প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া তথ্যমতে নেত্রকোনা জেলায় "মৌ" নামক স্থানে যাওয়ার পথে দুটো মুসলমান ইউনিয়ন খৃষ্টান ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। অথচ সেখানে ৫ টি মাদরাসা রয়েছে।

মি. বুশের একটি ভাষণ

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের পূর্বে এক ভাষণ দেন যা ১৪ টি ভাষায় প্রচারিত হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন – ঈশ্বর মার্কিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালোকে সম্প্রসারণ এবং মন্দকে প্রতিহত করতে। তাই এই সরকার বাইবেলে প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী মার্কিন জাতিকে রক্ষা এবং সারা বিশ্ববাসীকে গোলামীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছে। তিনি বলেন – মানুষকে মুক্ত করার জন্য আসলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে। মার্কিনীদের ছত্রছায়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের বাপ নেই, মা নেই, আর যারা বিধবা, স্বামী নেই, তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে খৃষ্টানদের দাওয়াতি কাজ

দৈনিক ইনকিলাবের এক সাংবাদিক সাদেক হুসেন তার একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলেছেন, রাঙ্গামাটি থেকে দুই দিনের দূরত্বে ভারতের সীমানার কাছে একটি ইউনয়ন আছে "সাজেক"। এ এলাকায় ২০ হাজার মানুষ আছে যারা ইংরেজিতে কথা বলে। গিটার বাজিয়ে ইংরেজি গান গায় আর ছেলে-মেয়েরা জিন্স প্যান্ট পড়ে। ইউরোপীয় স্টাইলে তাদের জীবনধারা।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রকাশিত একটি সূত্রমতে কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রভৃতি এনজিও দরিদ্র ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী উপজাতিরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সেখানে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড। আর এ কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কোন ঘটনা ঘটলেই পাড়া-পড়শি জানার আগেই তা পৌঁছে যায় বিশ্বব্যাপী। ঘটনাস্থলে থানার পুলিশ পৌঁছার আগেই ওয়াশিংটন, লন্ডন, টোকিও, ভ্যাটিকান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিবৃতি আসতে থাকে।

জুমল্যান্ড পরিকল্পনা

একাধিক আন্তর্জাতিক খৃষ্টানসংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আলাদা রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। মুসলিম রাজ্যের বুকে জুমল্যান্ড নামে একটি খৃষ্টানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। যেমনটি ইন্দোনেশিয়ায় "পূর্ব তিমুর" নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডতুল্য খনিজ সম্পদের অপার সম্ভাবনায়ময় এক দশমাংশ অঞ্চল তথা পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে তাদের এ নয়া রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা। ৭ মে ২০০৬ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সন্তু লারমার পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে স্বাধীন জুমল্যান্ডের পরিকল্পনা থাকলেও মিশনারিদের টার্গেট ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানো।

অবশ্য প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ মনে করেন, ইহুদি-খৃষ্টান বিশ্বের লক্ষ্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, এর সাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বৃহৎ খৃষ্টরাষ্ট্রের জন্ম দিবে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে ঐ সব অঞ্চলের উপজাতিদের মাঝে একই ধরনের মিশনারিগোষ্ঠীর জোরালো কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের মতে, এদের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে খৃষ্টানরাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলোর প্রতিরক্ষাবলয় সৃষ্টি করা। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের পার্বত্য এলাকা তথা মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মনিপুরে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় দেশীয় ও ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বিমুখী তৎপরতায় ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, যখন এ দুই পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাবে তখন সন্তু লারমা গং গণভোটের দাবী তুলবে। এদিকে ইহুদি-খৃষ্টানদের ক্রীড়নক জাতিসংঘ গণভোটের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে প্রতিষ্ঠা করবে তাদের স্বপ্নের স্বাধীন খৃষ্টরাষ্ট্র।

আমরা মুসলমানরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টাই, তাদের কাছে ইসলামের আমানত না পৌঁছে দেই, তাহলে আমাদেরও ভোগ করতে হবে পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের পরিণতি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে গরীব অসহায়দের চিকিৎসা সেবার নামে তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে খৃষ্টান বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তারা বাস্তবায়ন করে চলেছে। মিশনারিদের এই নিরন্তর সাধনায় তারা আদৌ ব্যর্থ হচ্ছে না।

খৃষ্টান বানানোর কৌশল

কৌশল ১ – যশোরে ফাতেমা নামক একটি হাসপাতাল আছে। প্রতিদিন সে হাসপাতালে প্রায় ছয়শত মুসলমান চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যায়। আর এ সুযোগে তারা ধর্মান্তরে আকৃষ্ট করার চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। জনৈক রোগীর ঘটনা, সে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলো। কর্তব্যরত নার্স তাকে তাকে একটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, এটা আল্লাহ'র নাম নিয়ে খেয়ো। সরল মহিলা সেবিকার পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করলো বটে, কিন্তু রোগ সারলো না। পরদিন আবার গেলে তাকে আরেকটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, যীশুর নামে খেয়ে দেখো সারে কিনা। এবার ঔষধ সেবনে তার রোগ সারলো। (মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ে সঠিক ঔষধ দিয়েছিলো) এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে দেশের সরলপ্রাণ আত্মভোলা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে মিশনারিরা।

কৌশল ২ – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগানের আড়ালে সেখানে কোমলমতি শিশুদের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর একটি এনজিও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে জনৈক শিক্ষিকা ছাত্রদের বললেন, বাড়িতে তোমাদের আব্বু-আম্মু তোমাদের বেশী ভালোবাসেন, না তোমাদের বাড়ির সেবকদের (কাজের লোকদের)। উত্তরে কোমলমতি শিশুরা বললো – বাবা-মা আমাদের বেশী ভালোবাসেন। তখন শিক্ষিকা বললেন – তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্নেহ করেন এজন্য যে, তোমরা তাদের সন্তান। তেমনই খৃস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু হলেন আল্লাহ'র পুত্র, আর মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ'র বান্দা ও দাস। এখন বলো, পুত্র হিসেবে আল্লাহ যীশুকে বেশী ভালোবাসেন, না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'কে ?

কৌশল ৩ – খৃষ্টানরা পরিকল্পিতভাবে খৃষ্টধর্মের বর্তমান বিকৃতরূপকে জাগতিক উন্নতি, পরকালের মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পেশ করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আত্মভোলা সহজ-সরল জনগোষ্ঠী, ধর্মান্তরিত হচ্ছে অনেক মানুষ। যাদের ধর্মান্তর করার জন্য টার্গেট করা হয়, তাদের ধারণা দেওয়া হয় যে, পূর্বের নবীদের উপর ঈমান রাখাও ইসলামের মৌলিক বিধান। এক্ষেত্রে ঈমান হিসেবে ঈমানে মুসাসসালের অংশবিশেষ "নবীদের উপর ঈমান আনয়ন" এর আবশ্যকতার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। এ ধরেনর প্রচারণার শিকার দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার আমীর হামযা সম্পর্কে জানা যায়, সে নিজেলে ঈসায়ী মুসলমান হিসেবে দাবী করে। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে "ঈমানে মুফাসসাল" কালেমার বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তি দেখায় যে, এতে

পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং তা আবশ্যক, সে নিরিখে সে ঈসায়ী মুসলমান। এ সব ঘটনা বিশ্লেষণে এ বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, ধর্মান্তর ঘটানোর জন্য যে কৌশলেরই প্রয়োজন দেখা দিক, সুচতুরভাবে তা প্রয়োগে তার সদা তৎপর থাকে।

কৌশল ৪ – মুসলিমুদ্দিন সানোয়ার নামে এক যুবককে (যিনি খৃষ্টানদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন) জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। সানোয়ার বললেন, আমি দুইবার মিশনারির প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। প্রথমবার শিকার হয়েছিলাম ১৯৮৭ সালে। বই পাঠে আমার প্রচণ্ড লোভ ছিল। একদিন একটি বইয়ে "পোস্ট বক্স নং" সংযুক্ত একটি ঠিকানা পেলাম। বইটি ছিল খৃষ্টান মিশনারির প্রকাশিত। আগে শুনেছি, খৃষ্টানদের চিঠি-পত্র লিখলে তারা প্রচুর বই পাঠায়। তাই কোন কিছু চিন্তা না করেই ঠিকানা অনুযায়ী পত্র লিখলাম। এর কিছুদিন পরই ডাক মারফত আমার ঠিকানায় বই আসলো, সাথে একটি প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্রটি দেখে বুঝলাম, বইগুলো পড়ে উত্তর দিতে হবে। হাতে সময় মাত্র সাত দিন। অনেক খুঁজাখুঁজির পর উত্তরগুলো লিখে পাঠালাম। পরবর্তীতে তারা আমার কাছে ডাকে আরো কিছু বই ও প্রশ্নপত্র পাঠালো। তখন আমি এইচ.এস.সি. ১ম বর্ষের ছাত্র। উত্তর লিখে নির্ধারিত বক্স নাম্বারে পাঠানোর পর তারা আবার এক সেট বই, প্রশ্নপত্র, নাম্বার ও সনদপত্র পাঠালো।

তৃতীয়বারের প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্ন দেখে একটু বিব্রতবোধ করলাম। প্রশ্নটি ছিল এরূপ – আপনি কি যীশুকে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করেন ? আমি জানতাম, এ প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যা বলি, তাহলে আরো বই আসবে, অন্যথায় বই পাঠানোর এ ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানের দাবীকেই আমি অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে "না" লিখে পাঠালাম।

কৌশল ৫ – সেই সানোয়ার দ্বিতীয়বার মিশনারির শিকার হলেন। সানোয়ার বলেন, আমি চাকরি পাওয়ার জন্য একদিন ঢাকায় ১০৫/১৬ মনিপুরী পাড়ায় সিএলবি অফিসের ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। পরিচয়পর্বের পর সেখানের এক কর্মকর্তা আমাকে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বেশ ধারণা দিতে লাগলো এবং বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে তার উক্তিগুলোর যুক্তি দিতে লাগলো। আমি নীরবে তার কথার সায় দিচ্ছিলাম। তার কথার সারমর্ম ছিল, যীশুই এ পৃথিবীর একমাত্র অভিভাবক। যীশুকে ছাড়া আল্লাহ'কে পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমার ইতিবাচক অবস্থাদৃষ্টে "ধর্মান্তর করা যাবে" মর্মে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো। সেদিন অফিস থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে ২১/২২ মার্চ ১৯৯৯ ইং সালে ট্রেনিংয়ে যোগদানের জরুরী আহবান জানিয়ে বিদায় নিলো। সম্ভবত ৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং সালের ঘটনা – একজন ফাদার আমাকে খৃস্টধর্মের বড়ত্ব সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ বুঝান। এরপর ধ্যানের আসনে বসিয়ে একটি বই থেকে কিছু পড়ালো, তখন আমার চোখ বন্ধ ছিলো। পড়া শেষে আমাকে বলা হলো, আপনি খৃষ্টান হয়ে গেছেন। এরপর খৃষ্টধর্মের স্বার্থকতা ও ইসলামধর্মের অসারতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা

করলো। এক পর্যায়ে আমাকে বললো – মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তি হিসেবে একজন সাধারণ মানুষ, ইসলামধর্মে তার কৃতিত্ব নেই। একমাত্র যীশুই সমস্ত কিছুর অধিকারী। যীশুর জন্ম না হলে এ পৃথিবীর জন্ম হতো না।

কৌশল ৬ – মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার একটি বড় কৌশল হলো, মিশনারিতে ধর্মান্তরিত হলেও নাম রাখে মুসলমানদের, যাতে মুসলমানরা বুঝতে না পারে। যেমন, যশোর জেলায় ফাতেমা হাসপাতাল নামে একটি মিশনারি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের প্রবেশমুখে শ্বেতপাথরে খোদিত সুন্দর একটি সিনারী আঁকা, এতে মাদার তেরেসার সদলবলে একটি সাঁকো পার হওয়ার দৃশ্য। ছবির নিচে সুন্দর করে লেখা – যীশু পীড়িত মানুষকে সেবাদানের জন্য এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ছবিটি হাসপাতালের প্রবেশ পথের সামনের দেওয়ালে এমনভাবে সাঁটানো যে, যে কোন দর্শনার্থী ও সেবাগ্রহীতা লোকের নজর কাড়ে। হাসপাতালের গেটম্যানের নাম মুহাম্মাদ সৈয়দ, মূলত এই লোকটি খৃষ্টান। তদ্রূপ হাসপাতালের এম. ডি. ও প্রধান ডাক্তারসহ প্রায় সবাই খৃষ্টান হলেও মুসলিম নাম ধারণ করেছে। যেমন, এম. ডি.র নাম মুহাম্মাদ বোখারী।

এই হাসপাতালের পিছনে একটি গির্জা আছে। গির্জা ও হাসপাতালের মাঝামাঝি একটি পার্ক আছে। এ পার্কে টিলার উপর কৃত্রিমভাবে নির্মিত বিশাল আকারের একটি নারীমূর্তি। এর সামনে কয়েকটি নারীমূর্তির হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করার দৃশ্য। কয়েকটি ভেড়া হা করে চেয়ে আছে বিশাল নারী মূর্তিটির দিকে। এর মধ্যে একটি ভেড়া অলস ঝিমুচ্ছে। রোগী ও দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলোর লীলা উপভোগ করছে। রোগীদের একঘেয়েমী দূর ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য এ ব্যবস্থা। পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলো দেখলে মনে হয় – এগুলো গির্জার মহিমা ফেরি করে বেড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে। সে পার্কে মিশনারির নিযুক্ত লোক দর্শনার্থী ও রোগীদের কাছে মূর্তিগুলোর অবস্থা বিশ্লেষণ করে মেরীর মহিমা প্রচার করে। যেমন, দর্শনার্থীদের বা রোগীদের বুঝায় যে, টিলার বড় নারী মূর্তিটি হলো মেরী, যাকে মরিয়ম বলা হয়। আর প্রণামরত ছোট ছোট নারী মূর্তিগুলো হলো স্বর্গীয় দূত, যাদেরকে আপনারা ফেরেশতা বলেন। অর্থাৎ, মেরী কোন একসময় পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গীয় দূতেরা তাকে দেখে প্রণাম করছে আর ভেড়াগুলো ঘাস খাওয়া বিরতি দিয়ে মেরীকে দেখছে। একটি ভেড়া বেখেয়ালে ঝিমুচ্ছে। স্থানীয় একজন আলিম জানান, রোগীদের পার্কে ঘুরানোর সময় গির্জার নিযুক্ত লোকেরা চাতুর্যের সাথে মেরীর মূর্তি ও গির্জার প্রতি ভক্তিমূলক ইঙ্গিত-ইশারা করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ তোলে। আর হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটানো যীশুর ছবি, সাঁকো পার হওয়া সংবলিত আর্ট, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যীশুর রোগীসেবা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের রোগীর বেডের আশেপাশে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বই ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে রাখা হয়, যেন অবসর সময়ে রোগী নিজ থেকে বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। এভাবে সেখানে লোকজনকে ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী

১৭-৮-৯৮ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার লক্ষ্মীরাজ গ্রামে দুইজন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রধান আতাউর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় ধর্ষিতারা জানান, গত ১লা আগস্ট প্রশিক্ষণের নামে ৯ জন মহিলাকে গ্রামের অফিস লক্ষ্মীরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত যাপনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে একটি কক্ষে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। রাত আনুমানিক ১ টার দিকে প্রতিষ্ঠানের পিয়ন অনুখুল ও মহিলা কর্মচারী লায়লা খাতুন তাদেরকে জানায়, বড় সাহেব তোমাদের সাক্ষাৎকার নিবেন। তারপর একজন একজন করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন লোক তাদেরকে রাতভর ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর থেকে পরদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত ঐ ঘরে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। ছেড়ে দেওয়ার আগে ঘটনাটি ফাঁস না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখানো হয়। পড়ে মহিলারা গ্রামে ফিরে নিজ নিজ অভিভাবককে জানালে এবং লোকমুখে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল বের করে। সেদিন থেকে এ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তথ্যপঞ্জি – দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক করতোয়া, ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া, দেশ জগত।

এ ধরনের বহু ঘটনা গ্রামবাংলায় ঘটছে। কোনটা পত্রিকার খবর হয়, আবার কোনটা হয় না। অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে এনজিওদের বর্বরতা চাপা দিয়ে রাখে।

দাওয়াতি কার্যক্রম

আজ খৃষ্টান মিশনারিরা নিষ্ঠার সাথে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আহবায়িত মানুষ হলো মুসলমান। তাই মুসলমানদের কাছে তাদের মিথ্যা দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তাই তো দেখা যায় গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, অফিস-আদালতে তাদের দাওয়াত চলছে। এমনকি আমাদের মসজিদেও তাদের দাওয়াত চলছে।

আজ থেকে বছর খানেক আগের কথা। আমি তখন মধ্য বাড্ডায় নৈশ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি। একদিন সকালে আমার এক ছাত্র এসে বললো, কে যেন একটি ইনজিল শরীফ রেখে গেছে। এভাবেই চলছে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম।

স্কুল-কলেজে তাদের দাওয়াত চলছে হ্যান্ডবিল ও বই-পত্রের মাধ্যমে। সেমিনারের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে, ঈসায়ী ধর্মই হচ্ছে গুনাহ থেকে মুক্তির একমাত্র সহজ পথ। কিন্তু আমরা কয়জন অমুসলিমকে দাওয়াত দেই ? কয়জন হিন্দুকে ইসলামের কথা বলি ? কয়জন খৃষ্টানকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় বলি ? খৃষ্টানরা তো জীবন বাজী রেখে আমেরিকা, ইতালি ও লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসে ধর্মপ্রচার করতে। তারা চলে যাওয়ার জন্য আসে না, এদেশেই তাদের অন্তিম সমাধি হয়। তার ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। এখানে একটিমাত্র উল্লেখ করছি।

ফাদার হুমরিক নামক এক খৃষ্টধর্ম প্রচারক বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত কর্মরত। তার প্রচেষ্টায় ৩০ হাজার গারো উপজাতি খৃষ্টান হয়েছে। আর আমি আপনি কয়জন অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পেরেছি ? এ দেশে তো কোন মুসলমান ছিল না। আমরা মুসলমান হয়েছি কিভাবে ? আমাদের আকাবিরগণ এদেশে এসেছেন ইসলাম প্রচার করার জন্য, তারা প্রচার করে চলে যাননি। দেখুন, সিলেটে শাহজালাল ইয়ামানী, খান জাহান আলী, কারামত আলী জৈনপুরী প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন আমৃত্যু এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।[২]

ঈমান বাঁচাতে এসে হয়ে যাচ্ছে বেঈমান

জাতি-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্য, অন্ন বাসস্থানে দরিদ্র বাংলাদেশ এনজিও ও মিশনারিদের জন্য এমনিতেই অতি উর্বর ক্ষেত্র। এখন যখন লাখ লাখ দরিদ্র অসহায় নিরক্ষর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আশ্রিত হয়ে বাংলাদেশে থাকছে, মিশনারি সংস্থাগুলো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়ার মতো অবস্থা।

যেহেতু বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা, ভারতের সেভেন সিস্টার্স, মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য ভেঙেচুরে একটি স্বাধীন খ্রিস্টরাজ্য বানাবার কাজ চলছে, তাই বাংলাদেশে শরণার্থী হয়ে আসা এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের মুসলিম থেকে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান বানাবার কোন সুযোগই মিশনারি ও এনজিও সংস্থার লোকেরা হাতছাড়া করার কল্পনাও করছে না। ছলে বলে কৌশলে তারা ধর্মান্তরকরণ চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মান্তরকরণ, প্রতারণা, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড, কোনটাই বাদ রাখছে না সেবার আড়ালে অপকর্ম করে বেড়ানো ধুরন্ধর এনজিওগুলো।

.

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৮, বৃহস্পতিবার, দৈনিক নয়া দিগন্ত 'সাহায্যের আড়ালে খ্রিষ্টান বানানো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের' শিরোনামের পুরো প্রতিবেদনটা অবিকল তুলে ধরছি –

উখিয়া ও টেকনাফে গত ৪-৫ মাসে খ্রিষ্টান হয়েছেন প্রায় আড়াই হাজার রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগ ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারি গ্রুপগুলো। দারিদ্র, অশিক্ষা

ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত রোহিঙ্গাদের সাহায্যের নামে সহজেই চলছে মিশনারি গ্রুপগুলোর ধর্মান্তরিত করার কাজ। কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজটি করছে কয়েকটি এনজিও। প্রাথমিক হিসেবে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে প্রলুব্ধ করে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের খ্রিষ্টান বানানোর কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঈসায়ী চার্চ বাংলাদেশ (আইসিবি) নামের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের প্রায় ১৫ জন নেতা উখিয়া ও টেকনাফে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। নগদ টাকা দেয়া ছাড়াও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। কক্সবাজার শহরের কয়েকটি অভিজাত হোটেলে তারা অবস্থান করে মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানোর কাজ করে যাচ্ছেন। উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এমন তথ্য। একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে রোহিঙ্গাদের প্রলুব্ধ করে খ্রিষ্টান বানানোর বিবরণ।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ভয়াবহ নির্যাতনে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা এখনো ট্রমায় আক্রান্ত। এ অবস্থায় প্রলোভনে পড়ে খ্রিষ্টান মিশনারি গ্রুপগুলোর নানা প্রস্তাব সহজেই লুফে নিচ্ছেন তারা। সামনে ঘোর অন্ধকার। তাই কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে কথা বিবেচনা করার অবস্থা তাদের নেই। যেকোনো অবলম্বন ধরে তারা বাঁচতে চান। চান নিরাপত্তা। এ সুযোগ ব্যবহার করছে ধর্মান্তরিতকরণ গোষ্ঠী ও মানবপাচারকারী চক্র। পাচারের পাশাপাশি সুন্দরী রোহিঙ্গা নারীদের বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেহব্যবসায় বাধ্য করছে ওই মানবপাচারকারী চক্রটি।

তথ্য মতে, খ্রিষ্টান বানানোর কাজে নিয়োজিত ঈসায়ি চার্চ বাংলাদেশকে অর্থায়ন করছে নেদারল্যান্ডস ও আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশ। এ সংগঠনটি রোহিঙ্গা মুসলিমদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য প্রলুব্ধ করতে ১১ থেকে ১৫ জন রোহিঙ্গাকে বাছাই করেছে যারা ইতিমধ্যে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। এসব রোহিঙ্গাকে বিশেষ সুবিধার পাশাপাশি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দেয়া হয়। তাদের প্রতি মাসে কক্সবাজার শহরের একটি ব্যাপ্টিস্ট চার্চে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই ১৫ জনকে সুপারভাইজ করেন কুতুপালং ব্লক বি-১ এ বসবাসরত জনৈক আবু তাহের (৪২)।

ধর্মান্তরিত রোহিঙ্গাদের খ্রিষ্টান নাম দেয়া হলেও কৌশল হিসেবে মুসলিম নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। তথ্য মতে, রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রথমে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন মিয়ানমারের মংডুর হাতিপাড়ার মৃত জালাল আহমদের ছেলে নুরুল ইসলাম ফকির (৫৫)। ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা যায়, এই নুরুল ইসলাম ফকির (খ্রিষ্টান নাম জানা যায় নি) পরিবারের ১৭ জন সদস্য নিয়ে ২০০৭ সালে বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া তার রোহিঙ্গা

আত্মীয়স্বজনকে খ্রিষ্টান ধর্মেধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে এ পর্যন্ত ৩০-৩৫ টি পরিবারকে এ পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হোন।

২০১৭ সালের ২৪ আগস্ট মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার অভিযোগে ২৫ আগস্ট থেকে সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা শুরু করে। জীবন বাঁচাতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নিলে খ্রিষ্টান হওয়া পরিবারগুলো অত্যন্ত কৌশলে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন ব্লকে ঢুকে বসবাস শুরু করে এবং ধর্মান্তরের কাজ চালাতে থাকে। এ কাজে নেতৃত্ব দেয়া নুরুল ইসলাম ফকিরের ছেলে এহসান উল্লাহ (৩৫) বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে কয়েক বছর আগে নরওয়ে পাড়ি দেন এবং সেখান থেকে টাকা পাঠাতে থাকেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান পরিবারগুলোর জন্য।

তার পাঠানো টাকায় কুতুপালং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শিবিরের বি ব্লকে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই স্কুলে বর্তমানে ৩০ জন ছাত্র আছে এবং স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নুরুল ইসলাম ফকিরের ছেলে সেলিম (১৭) কাজ করছেন। নুরুল ইসলাম ফকিরের নেতৃত্বে প্রতি রোববার চলে প্রার্থনা কার্যক্রম।

তথ্য মতে, কুতুপালংয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পে ৭২ টি পরিবার এবং বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ২৪ টি পরিবারকে (প্রতি পরিবারে গড়ে আটজন সদস্য) ইতিমধ্যেই খ্রিষ্টান করা হয়েছে। এ ছাড়া থাইংখালীর জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও ৪২ টি পরিবারকে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে। জামতলিতে নেতৃত্ব দেন জনৈক শরীফ (শরীফের বাড়ি বুচিদং) নামে এক রোহিঙ্গা। এ ছাড়া টেকনাফের জাদিমোরা নার্সারি এলাকায় ওবায়দুল হক নামে এক রোহিঙ্গার নেতৃত্বে ৪৫ টি পরিবারকে খ্রিষ্টান ধর্মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব পরিবারের সদস্যরা ওবায়দুল হকের বাসায় প্রতি রোববার এবং মাঝে মাঝে শুক্রবারও প্রার্থনা সভায় মিলিত হন।

এ ছাড়া নয়া মুছনি পাড়ায় ১২ টি রোহিঙ্গা পরিবারকে ধর্মান্তরিত করার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের দেখাশোনা করেন আলী জোহা নামে এক রোহিঙ্গা। আলী জোহার অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই রফিক (বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গমন) এসব পরিবারের জন্য নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পাঠান। অপরদিকে নয়া মোচনি পাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নুরুল ইসলাম ফকিরের বোন হালিমা খাতুন পাঁচটি রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবারকে নিয়ে নিয়মিত খ্রিষ্টান ধর্মীয় সভা করেন এবং তাদের আর্থিক সহায়তা দেন।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গা আশ্রিত এলাকায় খ্রিষ্টান বানানোর কাজ মনিটরিং করেন মাবুদ নামের জনৈক খ্রিষ্টান। তিনি রোহিঙ্গাদের নগদ আর্থিক সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি প্রলুব্ধ করে থাকেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ পরিবারকে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।’

এটা গেল গত জানুয়ারির (২০১৮) কথা। যখন আলেম-উলামা ও দেশের ইসলামপ্রিয় জনতা বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। এর আগে, অর্থাৎ দুই হাজার সতেরো সালে মিয়ানমারের সেনা কর্তৃক গণহারে রোহিঙ্গা নিধনের আগে আমরা শরণার্থীদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম, তখনো মিশনারি ও এনজিও সংস্থাগুলো নানান উপায়ে রোহিঙ্গাদের খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলেছে।

.

৩১ মার্চ, ২০১৫, মঙ্গলবার। দৈনিক নয়া দিগন্ত 'দরিদ্র রোহিঙ্গাদের ধর্মান্তরিত করছে এনজিওরা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপে। সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য অবিকল তুলে ধরছি –

'দরিদ্র রোহিঙ্গা মুসলিমদের অর্থবিত্ত ও উন্নত দেশে পুনর্বাসনের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে বিভিন্ন এনজিও সংস্থা। বিশেষ করে কক্সবাজারে উখিয়া-টেকনাফের রোহিঙ্গা বস্তি ও শরণার্থী ক্যাম্পগুলোকে টার্গেট করেছে তারা। এরই মধ্যে টেকনাফের ৫৩ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মে দীতি করার সত্যতা পেয়েছে প্রশাসন। দীর্ঘ দিন ধরে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিভিন্ন এনজিওর অপতৎপরতা চলছে।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে দিশারী মিশনারি ক্যাম্পে টেকনাফ থেকে ৫৩ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ পেয়ে টেকনাফ উপজেলা প্রশাসনের টনক নড়ে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মোজাহিদ উদ্দিন বাঁশখালী থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেরা সনজিদা ও মোঃ হারুনের জবানবন্দী রেকর্ড করেন। তারা ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের কাছ থেকে কিতাবুল মোকাদ্দস বইটি জব্দ করেন।

আগেও উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা বস্তি থেকে আরো ২৫ জন নারী-পুরুষকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে।' .....

'জানা গেছে, মার্টিন মন্নান শাহীন নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে টেকনাফে লেদা রোহিঙ্গা বস্তিসহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের টার্গেট করে ধর্মান্তরের এ প্রক্রিয়া শুরু করেন। শাহীন নূর বেগম প্রকাশ নুরুনীর মাধ্যমে টেকনাফে তাদের নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে।উল্লেখ্য, গত ১৮ মার্চ টেকনাফ থেকে দালালদের মাধ্যমে ৫৩ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষকে হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণের নামে বাঁশখালী উপজেলার কালিপুর ইউনিয়নের গুনাগরি এলাকায় দিশারী ক্যাম্প নামে একটি এনজিও সংস্থার ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাতের পর কিতাবুল মোকাদ্দস নামে একটি গ্রন্থ ধরিয়ে দেয়া হয়।

তারা টেকনাফে ফিরে আসার প্রায় দুই সপ্তাহ পর এ ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি হয়। টেকনাফের ৩৩ জনের সাথে কক্সবাজার ও উখিয়ার মনখারী থেকে আরো ২০ জন এই দলটির সাথে সেখানে গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

কিতাবুল মোকাদ্দস বইটিতে লেখা রয়েছে ‘ট্রান্সলেট অফ বাইবেল’ আবার ভূমিকায় এটিকে ইঞ্জিল শরিফের বাংলা অনুবাদ বলা হয়েছে। বইটির পাবলিশার্স হিসেবে দ্য বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৯০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১২১৭ ও বি.বি.এস ঢাকা, বাংলাদেশ লেখা রয়েছে।

তবে মার্টিন মন্নান মৃধার সাথে সোমবার সন্ধ্যা ৭ টায় মোবাইলে কথা বললে তিনি ধর্মান্তরিত করার বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, ‘মূলত আমরা ওই রোহিঙ্গাদের হাঁস-মুরগি পালনসহ বেকারত্ব দূরীকরণে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছি। প্রশিক্ষণকালে তারা আমাদের লাইব্রেরী থেকে খ্রিস্ট ধর্মীয় বিভিন্ন বই পড়তে নিয়েছে। ধর্মান্তরের বিষয়টি সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে এখানে জোরাজুরির কিছু নেই।’

.

রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টের অনুসারী বানাবার চাতুর্য বিষয়ে অনেক বলাবলি হয়েছে, মিটিং সমাবেশ বিবৃতি হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তারা সেবা প্রদানের বিনিময়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করছে। কতটা ধূর্ত হলে একটা অসহায় জাতিকে জাহান্নামি বানাতে পারে।

এই লোকগুলো যদি নিজের দেশে থাকতেই খ্রিষ্টান হতো, তা হলে হয়তো অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশে আসতে হতো না। যে ঈমানের কারণে তারা নিজের দেশের সেনা কর্তৃক বর্বরতার শিকার হলো, সে তারাই ধুরন্ধর মিশনারিদের ফাঁদে পড়ে ঈমান বলি দিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেল! ব্যাপারটা কি আমাদের একটু ভাবাবে?

জোর যার মুল্লুক তার

‘বাংলায় বাজে গির্জার বাঁশি’ বই যখন প্রথম প্রকাশ পায় দুই হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বরে, তখন বইটিতে রোহিঙ্গা শিবিরে এনজিওদের বিষয়ে এসে বলেছিলাম, ‘আমাদের করে আসা মসজিদগুলোর আজান বন্ধ হয়ে গির্জার ঘণ্টা বাজবে।’

হ্যাঁ, অন্তত একটা মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। দুই হাজার আঠারো ঈসায়ি বর্ষের মাঝামাঝিতে। সংবাদমাধ্যমগুলোতে ভয়াবহ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই তথ্য। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সবচেয়ে বড় মসজিদটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। কারণ হিসেবে সেখানে একটি ব্রিজ ও অফিস তৈরি হবে বলা হয়।

কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালংয়ে মধুরছড়া পাহাড়ে রোহিঙ্গা মসজিদটি করেছিল বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস। পরে তাদের আন্দোলন বিবৃতি ছড়িয়ে পড়ে গণমাধ্যমে।
গত (২০১৮ সালের) ১৬ এপ্রিল অনলাইন নিউজ জার্নাল 'আওয়ার ইসলাম' 'কিছু দুষ্ট এনজিওর প্ররোচনায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মসজিদটি ভাঙ্গা হয়েছে' খবর প্রকাশ করেছে। সেখান থেকে সরাসরি তুলে ধরছি –
'কক্সবাজারের কুতুপালং এর মধুরছড়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ. মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।' ......
'বিক্ষোভ পরবর্তী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা মাহফুজুল হক .... অভিযোগ করে বলেন, কিছু দুষ্ট এনজিওর প্ররোচনায় কুতুপালং-এর সর্ববৃহৎ মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।
সমাবেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন বলেন, মসজিদ ভাঙার সাহস এনজিওরা কোথায় থেকে পেয়েছে আমরা জানতে চাই। কোনো আলোচনা ছাড়া মসজিদ ভাঙ্গার ফলাফল খুব বেশি ভালো হবে না। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'
দৈনিক ইনকিলাব ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভেঙে ফেলা মসজিদ পুনর্নির্মাণ' শিরোনামের খবর থেকে আমাদের বিষয়বস্তুর অংশ কোট করছি –
'কুতুপালং মধুরছড়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ. মসজিদ ভেঙে ফেলায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। .... এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ... দেশের আলেমসমাজ তাঁদের ঈমান আকিদা হেফাজতের লক্ষ্যে নিজেরা অর্থ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মসজিদ, মক্তব কায়েম করেছে। .... কিছু ইসলামবিদ্বেষী এনজিওদের প্ররোচনায় এবং ক্যাম্প ইনচার্জ ম্যাজিস্ট্রেট এনামুল হক পাভেলের নির্দেশে কুতুপালং এর সর্ববৃহৎ মসজিদটি ভেঙে ফেলা হয়েছে।'
এপ্রিল ১৬, ২০১৮ তারিখে অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল' শিরোনামের খবরে লিখেছে,'.... আজ সকাল দশটায় স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে একটি এনজিও কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নামে নির্মিত একটি বিশাল মসজিদটি ভেঙে ফেলে। .....'
হ্যাঁ, ধর্মান্তরকরণ, মসজিদ ভাঙা, প্রতারণা করা যদি আর্ট হয়, এনজিওদের এই আর্টের গুরু মানতে হয়।

আমি বলছি না সব এনজিও প্রতিষ্ঠানই সমান ধুরন্ধর, আপনি যদি আপনার ধর্ম প্রচার করতে আসেন, তবে নিষ্ঠার সঙ্গে করুন। অর্থের প্রলোভন দিয়ে শঠতার বিস্তার ঘটিয়ে কেন একজন মানুষের বিশ্বাস হরণ করছেন! কেন বিভিন্ন বিষয়ে প্রতারণায় আশ্রয় নিচ্ছেন!

দুই হাজার সতেরোর সেপ্টেম্বরে (এবং তার পরবর্তীকালে) কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে দেশসেরা এনজিও সংস্থা ব্র্যাকের কিছু দুঃসাহসিক কাজ দেখেছি। সমগ্র দেশবাসী ত্রাণ এনেছে, আলেমরা তত্ত্বাবধান করেছে, জোয়ানেরা শ্রম দিয়েছে।

উনছিপ্রাং ক্যাম্পে যেদিন বিজিবির উপমহাপরিদর্শক পরিদর্শনে আসবেন, তার আগের বিকেলে ব্র্যাক পুরো ক্যাম্পজুড়ে তাদের ফেস্টুনে ছেয়ে ফেলেছে। উখিয়া, কুতুপালংসহ (আমার অবশ্য ওদুটোতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি) সব ক্যাম্পেই একই কাণ্ড করেছে তারা।

নাহ, এই দেখা শুধু আমার নয়, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম আওয়ার ইসলাম 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আলেমদের স্থাপিত নলকূপ-শৌচাগারে স্টিকার লাগাচ্ছে এনজিওগুলো' শিরোনামে সংবাদ ছেপেছে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ ইসায়িতে। সরাসরি সংবাদ থেকে আমাদের প্রাসঙ্গিক অংশ নোট করছি –

'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আলেমদের স্থাপিত নলকূপে রাতের আঁধারে এনজিও সংস্থাগুলো নিজেদের স্টিকার লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও নেত্রকোণা জেলার সভাপতি গাজী আবদুর রহিম। সম্প্রতি তিনি উখিয়ার বালুখালী, থ্যাংখালী, কুতুপালংয়ে নির্যাতিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করতে গেলে রোহিঙ্গাদের কাছে এমন তথ্য পান বলে জানান। ...'

'তিনি বলেন, আমরা যখন উখিয়া উপজেলার বালুখালী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে গেলাম, তখন স্থানীয় অনেকেই অভিযোগ করেন, আলেম উলামাদের স্থাপিত টিউবওয়েল, শৌচাগার ইত্যাদিতে এনজিও সংস্থাগুলো রাতের অন্ধকারে নিজেদের স্টিকার লাগাচ্ছে।'

আমি যখন গিয়েছিলাম, মাত্র সেনাবাহিনী নেমেছে সেখানে। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মহড়া দিচ্ছিল সর্বত্র। তখনো রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো উন্মুক্ত ছিল। এখন তো সর্বসাধারণের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ব্র্যাক যেহেতু নিবন্ধিত দাতা সংস্থা, তাদের প্রবেশে বেগ পেতে হচ্ছে না। তাদের মতো সংস্থাগুলো সেখানে রোহিঙ্গা শিশুগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সব রকমের চেষ্টা করে যাচ্ছে। দম্পতিগুলোকে জন্মনিরোধের উপকরণ ধরিয়ে দিচ্ছে। মহিলাদেরকে স্বাবলম্বিতার প্রলোভন দেখিয়ে পর্দা থেকে বের করার চেষ্টা করছে।

আমাদের ঘাড়ে এখানেও হয়তো শুরু হবে খ্রিস্টবাদের জয়জয়কার।

মেঘলা আকাশে বজ্রপাত

অপকর্ম করে বেড়ানো এই এনজিও ও মিশনারি সংস্থাগুলো নির্বাধায় তাদের কাজ করে যাচ্ছে। এর বিপরীতে আলেমদের পরিচালিত সাধারণ মুসলিমদের অংশগ্রহণমূলক সেবা সংস্থাগুলো সেখানে নিষিদ্ধ। কারণ একটাই, লাইসেন্স নেই। রোহিঙ্গা শিবির থেকে দফায় দফায় বিভিন্ন এনজিও ও সেবা সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিদেশি এনজিও যেমন আছে, দেশি-ও আছে, নির্ঝঞ্ঝাট মুসলিমরাও আছেন।

২০১৮ ইসায়ির ১৭ আগস্টে দৈনিক সমকাল 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিষিদ্ধ ৪১ এনজিও' শিরোনামে সংবাদ ছাপে।

১৮ আগস্ট, ২০১৮ ইসায়িতে দৈনিক জনকণ্ঠ 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৪১ এনজিওর কার্যক্রম নিষিদ্ধ' হেড লাইনে ছাপে খবর।

৩ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১২ এনজিও নিষিদ্ধ' শিরোনামে খবর প্রকাশ করে 'একাত্তর লাইভ ডট কম'।

এভাবে বলতে থাকলে ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

১৭ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক সমকালের খবর থেকে বলছি,

'এনজিওগুলোর জন্য প্রযোজ্য বিদেশি অনুদান রেগুলেশন আইনে বলা হয়েছে- 'কোনো এনজিও বা ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা আদেশের লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন এবং সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ও অশালীন কোনো মন্তব্য করিলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করিলে বা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা সহায়তা করিলে অথবা নারী ও শিশু পাচার বা মাদক ও অস্ত্র পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকিলে উহা দেশে প্রচলিত আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।'

তার মানে এনজিওগুলোর অনেকেই শুধু প্রতারণা আর ধর্মান্তরই নয়, সরাসরি রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডেও জড়িত!আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আমাদের দেশের মুসলিম হিন্দু উপজাতি বৌদ্ধ গারো সাঁওতালদের যেমন মিশনারিদের থাবা থেকে রক্ষা করতে পারিনি এবং পারছি না, রোহিঙ্গাদেরও করছি না। আমরা হিন্দু ভাইদের কালিমার দাওয়াত দিচ্ছি , খ্রিস্টানদের সাথে তর্ক জুড়ছি, মুসলিমদের ঈমান রক্ষা করতে পারছি না।আমরা নানানভাবে উৎসাহিত হয়ে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যাই; কিন্তু এক কমান্ড মানতে পারি না। যা কিছু করি, নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের দলের ক্রেডিট তালাশ করি। জি হ্যাঁ, আমাদের আরও অনেক ক্রেডিট দরকার, আর মিশনারিদের দরকার শুধু দেশের সমস্ত মানুষকে খ্রিষ্টান বানাবার। আমাদের দলের ক্রেডিট তাদের ধর্মান্তরকরণের চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই না![৩]

মিশনারী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে: ভয়াবহ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ।

সম্প্রতি কুকি-চিন সন্ত্রাসীগোষ্ঠী আলোচনায় আসার জন্য আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বম (Bawm) জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের ব্যাপারেও জানতে পারছি। যদিও তারা সংখ্যায় খুব বেশি না, ১৫ হাজারেরও কম হবে। কিন্তু তাদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হয়ে গেছে। সেই বাইবেল অনলাইনে কিনতে পাওয়া যায়, গুগল প্লেস্টোরে বম (Bawm) ভাষায় ফ্রি বাইবেলের অ্যাপও পাওয়া যায়। বম জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত খ্রিষ্ট ধর্মালম্বী। আমাদের বাংলাদেশ খুব বড় দেশ না হলেও এই দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ভাষার মানুষ বাস করে। চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতালসহ আরো বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এদের মাঝে অন্যতম। তাদের অধিকাংশই এখন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত। তাদের প্রত্যেকের ভাষাতেই এখন বাইবেল অনুবাদ আছে এবং সেগুলোর হার্ডকপির সাথে সাথে ফ্রি অ্যাপও রয়েছে। যদিও ৩০-৪০ বছর আগেও হয়তো চিত্র এমন ছিল না, তাদের অন্য ধর্মবিশ্বাস ছিল। এটা ভেবে কি অবাক লাগে না যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তারা খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল আর তাদের ভাষাতে বাইবেলের মতো বিশাল গ্রন্থ অনুবাদ হয়ে গেল আর এত সহজলভ্য হয়ে গেল?

পশ্চিমা দেশগুলোর বিশেষ করে আমেরিকান খ্রিষ্টান মিশনারীরা বিশ্বময় তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাপক আত্মনিয়োগ করছে। পৃথিবীর হেন অঞ্চল নেই যেখানে তাদের পদচারণা নেই। পৃথিবীর নানা দুর্গম অঞ্চলেও তারা তাদের ধর্ম প্রচার করে, হাজার হাজার ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে তারা মানুষের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছে। বাংলাদেশ আর ভারতের এত ভাষাতে তারা বাইবেল অনুবাদ করেছে ও অনলাইনে ফ্রিতে উন্মুক্ত করে দিয়েছে যা রীতিমত অবিশ্বাস্য। এই অঞ্চলে এত ভাষা আছে সেটাই হয়তো অনেক মুসলিম জানে না, অথচ খ্রিষ্টান প্রচারকরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে এসব ভাষা শিখেছে, এরপর সেই ভাষায় নিজেদের ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেছে।

আমরা মুসলিমরা হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে আছি, অথচ বাংলা ভাষাতেই খুব ভালো মানের সাবলীল কুরআনের অনুবাদ খুব বেশি নেই। এই দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষায় কুরআন বা কোনো হাদিসের গ্রন্থ অনুবাদ করার কথা তো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, আল্লাহর কালামকে আমরা এসব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কথা চিন্তাও করিনি। ওদিকে ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিষ্টান প্রচারকরা দূর দেশ থেকে এসে এদেরকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছে। আমরা আমাদের দ্বীনকে এসব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারিনি, কেননা আমরা অনেক 'জরুরী' কাজে ব্যাস্ত। তারাবী ৮ রাকাত নাকি ২০ রাকাত, হাত নাভির উপরে নাকি নিচে বাঁধব – এসব নিয়ে যুদ্ধ না করলে কি উম্মাহ উদ্ধার হবে নাকি? আমাদের ওয়াজ-মাহফিলে অনেক মানুষের ভিড় হয়, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সেখান থেকে ভিন্ন

মাসলাকের ভাইকে কিছু কটূ কথা বললে বা কিছু ভাইরাল ডায়লগ দিলে তো আরো ভালো। পাহাড়ী মানুষদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর আর কী দরকার।

পাহাড়ী গরিব মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, ঐদিকে আমরা দৃষ্টি দেইনি; খ্রিষ্টান মিশনারীরা ঠিকই তাদের খাবার দিয়েছে, চিকিৎসা দিয়েছে, তাদের জন্য স্কুল করেছে। এদিকে আমরা মিলাদ পড়িয়ে আর মানুষের থেকে 'হাদিয়া' নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছি। খ্রিষ্টান মিশনারীরা ওদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে বাইবেল, তাদের জন্য ঐ অঞ্চলে চালু করেছে খ্রিষ্টীয় এফএম রেডিও। এদিকে আমরাও "বিশাল" কাজ করে চলছি, "Yahooদি-নাসারার চক্রান্ত" বলে কিছু হুঙ্কার দিচ্ছি। আমাদের হুঙ্কারে কিছু শ্রোতা উদ্বেলিত হচ্ছে। ওদিকে পার্বত্য অঞ্চলে, উত্তরাঞ্চলে, সীমান্ত অঞ্চলে এমনকি শহরাঞ্চলেও দলে দলে মানুষের কাছে যিশুর বাণী পৌঁছে দিয়ে ব্যাপ্টাইজ করছে খ্রিষ্টান মিশনারীরা। এদিকে আমরা এমন কার্যকলাপ করছি তা দেখে যারা দ্বীনের মধ্যে আছে তারাও দ্বীন ছেড়ে দেবার উপক্রম। এসব নিয়ে ভেবে আর কী হবে, কিছুদিন পরে হয়তো ঈদের নামাজে কয় তাকবির, লোকাল নাকি গ্লোবাল, খাদ্য নাকি টাকা – এইসব নিয়ে কিঞ্চিত মহাযুদ্ধ চালিয়ে দ্বীনের শান-মান বৃদ্ধিতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব।

আমাদের উচিত নিজেদের কর্মপন্থা নিয়ে আরেকবার ভাবা। আমরা কি আসলেই রহমাতাল্লিল আলামিন মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আনিত দ্বীন অনুসরণ করছি, নাকি এর নাম করে অন্ধ মাসলাকবাজি, স্বার্থপরতা, দুনিয়াপ্রীতি আর হিংসা-বিদ্বেষের চর্চা করছি – এই জিনিসটা একবার চিন্তা করা দরকার। খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাদের বিকৃত হয়ে যাওয়া কিতাব ও ধর্মের জন্য যা করছে আমরা কি আল্লাহর সত্য দ্বীনের জন্য এর সিকিভাগও করছি?[৪]

৩. মিশনারীদের প্রচারিত বিভ্রান্তিকর লিফলেট ও বই পত্রের জবাব

বাংলাদেশে মিশনারিদের দুঃসাহস এতটাই বেড়ে গেছে যে, ওরা প্রকাশ্যে দোকানে দোকানে,ঘরে ঘরে ওদের বই-পুস্তক বিতরণ করে চলেছে।নতুন কৌশল হিসেবে ওরা ওদের বই-পুস্তকগুলোতে কুরআনের বরাত দিয়ে নিজেদের মতলবের কথাগুলো তুলে ধরছে। সরলপ্রাণ মুসলমানদের দৈন্যদশা ও দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে পুঁজি করে ওরা হাজার হাজার মুসলমানকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে।তারা বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য সমৃদ্ধ লিফলেট ও বই বিতরণ করছে। নিচের আর্টিকেলে মিশনারিদের কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্যের জবাব দেওয়া হয়েছে

–

◌ّ◌َ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী এবং একমাত্র অনুসরনীয়

আল্লাহ তাআলা আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা। মানুষকে তিনি সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। তাই মানুষ পশুর মতো চলতে পারে না। তাকে চলতে হবে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী। তবে মানুষের পক্ষে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ'র সন্তুষ্টির পথ বুঝতে পারাও কঠিন। তাই তিনি তার লালন-পালন কাজের অংশ হিসেবে দয়া করে আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির পথও জানিয়ে দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যুগে যুগে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাদের অনেকের উপর আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন তাদেরই একজন। আর তাদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

- নবী-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্যই যেহেতু মানুষকে আল্লাহ'র সন্তুষ্টির পথ দেখানো, তাই আলাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা নবী-রাসুলগণের অনুসরণের উপরই কেবল নির্ভরশীল। এজন্যই আল্লাহ তাআলা যতো নবী পাঠিয়েছেন তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করাও তিনি তাদের নিজনিজ কওম বা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। হযরত ঈসা আঃ এর আমলে তাকে অনুসরণ না করে হযরত মুসা আঃ কে অনুসরণ করার দাবি যেমন অবান্তর, তেমনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলেও তাকে অনুসরণ না করে হযরত ঈসা আঃ বা পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীকে অনুসরণ করাও অবান্তর।
- বিশেষত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সকল নবী-রাসুলের সর্দার ছিলেন, তাই তার আমলে শুধু উম্মতই নয়, কোন নবীও জীবিত থাকলে তাকেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পেতে অবশ্যই নবীজীর অনুসরণ করতে হতো। এজন্যই তো তিনি বলে গেছেন, "মুসা যদি এ আমলে জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার গত্যন্তর থাকতো না।"
- তাছাড়া হযরত মুসা ও ঈসা আঃ যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং তিনি আগমন করলে তাকে অনুসরণ করার কড়া নির্দেশ স্ব-স্ব উম্মতকে দিয়ে গেছেন, তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পর তাকে অনুসরণ না করলে মুসা ও ঈসা আঃ কে অনুসরণ করার দাবি অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়।
- এতসব সত্ত্বেও খৃষ্টান মিশনারীরা হযরত ঈসা আঃ কে জগতের ত্রাণকর্তা, তার অনুসরণই একমাত্র মুক্তিরর পথ, সোজাপথ ইত্যাদি অন্যায় দাবি করে মুসলমানদেরকে সেদিকে আহবান জানাচ্ছে। অনেক মুসলমানের অজ্ঞতা ও দৈন্যদশাকে পুঁজি করে তাদের কাছে ওরা পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করছে।

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওরা পুস্তক-পুস্তিকাগুলোতে কুরআনের বরাত দিয়ে ওদের মতলবের কথাগুলো তুলে ধরছে।

- আমাদের প্রশ্ন হলো মিশনারীরা কি কুরআনকে আল্লাহ’র কালাম বলে বিশ্বাস করে ? যদি বিশ্বাস না করে তবে এর বরাত দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজের মতলব প্রমাণ করার অপচেষ্টা প্রতারণা নয় কি ? আর যদি বিশ্বাস করে তবে কুরআনের শিক্ষাই তো নিম্নরূপঃ
- (১) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়,
- (২) আল্লাহ’র কোন শরীক নেই,
- (৩) ঈসা আঃ কেবল আল্লাহ’র রাসুল ছিলেন,
- (৪) যারা বলে ঈসাই আল্লাহ, তারা কাফের,
- (৫) যারা বলে আল্লাহ তিনের একজন, তারা কাফের,
- (৬) ঈসা বলেছেন, আমি আল্লাহ’র গোলাম, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।
- তাহলে খৃষ্টানরা এসব সুস্পষ্ট কথা অমান্য করে ঈসা আঃ কে খোদার পুত্র খোদা, তিন খোদার এক খোদা বানিয়ে নিয়েছে কেন ? বাইবেলের কোথাও তো একাধিক খোদা থাকার কোন প্রমাণ নেই। বরং বাইবেলে তাওহীদ বা আল্লাহ একজন হওয়ার কথাই বারবার বলা হয়েছে। যেমন –
- **মিশনারীদের অপপ্রচার বর্তমান বাইবেলেরও পরিপন্থী**
- (১) বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে আছে,
- “আল্লাহ’ই মাবূদ এবং তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই।” (৪ : ৩৫, ৩৯)
- “শুধু আমি আল্লাহ’ই তোমাদের মাবূদ।” (৫ : ৯)
- “বনী ইসরাঈলরা শোন, আমাদের মাবূদ আল্লাহ এক।” (৬ : ৪)
- (২) বাইবেলের ইশাইয়া / যিশাইয় পুস্তকে আছে,
- “আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন উদ্ধারকর্তা নেই।” (৪৩ : ১২)
- আল্লাহ বলেন, “আমিই প্রথম ও আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই।” (৪৪ : ৬)
- আল্লাহ বলেছেন, “আমি একাই আসমানকে বিছিয়েছি, আর নিজেই দুনিয়াকে মেলে দিয়েছি।” (৪৪ : ২৪)
- (৩) বাইবেলের শামুয়েল পুস্তকে আছে, “হে আল্লাহ মাবূদ, তুমি কতো মহান! তোমার মতো আর কেউ নেই এবং তুমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই।” (৭ : ২২)

- (৪) বাইবেলের জবুর শরীফ অংশে বলা হয়েছে, “একমাত্র তুমিই আল্লাহ।” (৮৬ : ১০)
- আল্লাহ যদি তিনজন হতেন তাহলে হযরত মুসা, শামুয়েল, দাউদ, ইশাইয়া প্রমুখ নবীগণ তা প্রচার করলেন না কেন ? সর্বোপরি হযরত ঈসা যাকে খৃষ্টানরা মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে তিনিই বা কেন তা প্রচার করলেন না। বর্তমান ইঞ্জিল শরীফের কোথাও নেই যে, ঈসা আঃ নিজেকে খোদা হিসেবে প্রচার করেছেন। বরং এর বিপরীত তিনিও এক খোদা ও একত্ববাদই প্রচার করেছেন। যেমন –
- (১) ঈসা বলেছেন, “তোমাকে অর্থাৎ একমাত্র সত্য খোদাকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মসীহকে গভীরভাবে জানতে পারাই অনন্ত জীবন।” (ইউহোন্না/যোহন, ১৭ : ৩)
- (২) মার্কের ইঞ্জিলে আছে, ঈসা বলেছেন, “সবচেয়ে দরকারি হুকুম এই, ইস্রায়েলীরা শোন, প্রভু যিনি আমাদের খোদা তিনি এক, আর তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভু, যিনি তোমার খোদা তাকে মহব্বত করবে। তার পরের দরকারি হুকুম এই, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করবে।” (মার্ক ১২ : ২৯-৩১)
- মথিও তার লিখিত ইঞ্জিলে উক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছেন এবং শেষে হযরত ঈসার এ উক্তিও তুলে ধরেছেন যে, “মুসার গোটা শরীয়ত এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষা এ দুটি হুকুমের উপরেই নির্ভর করে আছে।” (২২ : ৩৭-৪৩)
- নবী-রাসুলগণের দুটি পরিচয়। একদিকে তারা যেমন মানুষ, আল্লাহ’র দাস ও গোলাম; অন্যদিকে তারা তার মনোনীত নবী, রাসুল। আল্লাহ হিসেবে নিজের পরিচয় না দিয়ে হযরত ঈসাও অন্যান্য নবীদের মতো নিজেকে উক্ত দুটি পরিচয়েই তুলে ধরেছেন। ইঞ্জিলের শতাধিক স্থানে পাওয়া যায় যে, তিনি নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেছেন। আবার নিজের প্রতি ইংগিত করে তিনি বলেছিলেন, “নিজের গ্রাম ও নিজের বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবীরা সম্মান পান।” (মথি ১৩ : ৫৭)
- হযরত ঈসা আঃ এর যুগের লোকেরাও তাকে খোদা হিসেবে নয়, নবী হিসেবেই চিনত। ইঞ্জিল শরিফেই আছে, “ঈসা জেরুজালেমে ঢুকার পর শহরের সমস্ত জায়গায় হুলস্থুল পড়ে গেলো। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, ইনি কে ? লোকেরা বললো, উনি গালীলের নাসরত গ্রামের ঈসা নবী।” (মথি ২১ : ১০-১১)
- বর্তমান ইঞ্জিলেই বলা হয়েছে, “খোদা এমন যাকে দেখা যায় না।” (১ তীমথিয় ১ : ১৭) অন্যত্র বলা হয়েছে, “খোদা মানুষের তৈরি ঘরবাড়িতে থাকেন না।” (প্রেরিত ৭ : ৪৮)

- তবে কি হযরত ঈসা আঃ কে কেউ দেখতে পায়নি ? তিনি কি মানুষের তৈরি ঘর বাড়িতে বসবাস করেননি ?

- **মুজিজা নবী হওয়ার দলীল নাকি খোদা হওয়ার দলীল ?**
- খৃষ্টানরা ঈসা আঃ এর মুজিযাগুলোকে তার খোদা হওয়ার দলীল বানিয়েছে। কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইউহোন্না লিখিত ইঞ্জিলের ভুমিকায় বলা হয়েছে, "জনসাধারণের সামনে করা হযরত ঈসা মসীহের সাতটি কেরামতি কাজ, যেগুলোকে হযরত ইউহোন্নার চিহ্ন-কাজ বলেছেন, সেগুলোকে ঘিরেই তিনি তার সুসংবাদটি সাজিয়েছেন। প্রত্যেকটি চিহ্ন-কাজ কোন না কোনভাবেই প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা আল্লাহ।" [বাংলা কিতাবুল মুকাদ্দাস (বাইবেল) ১৪৪]

- আশ্চর্য কথা! মুজিযা কিভাবে খোদা হওয়ার প্রমাণ হয়। সকল নবীকেই তো আল্লাহ তাআলা কম বেশী মুজিযা দান করেছেন। তারা কেউ খোদা হলেন না। ঈসা আঃ খোদা হয়ে গেলেন! মুসা আঃ এর লাঠি অজগর সাপ হওয়া, সেই লাঠির আঘাতে একটিমাত্র পাথর থেকে বারটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হওয়া, সালেহ আঃ এর দুয়ায় পাথর থেকে জীবন্ত উটের বাচ্চা বেরিয়ে আসা ইত্যাদি কি মুজিযা নয় ? তবে তারা খোদা হতে পারলেন না কোন দোষে ?
- মুজিযা আল্লাহ তাআলার'ই কাজ, যা তিনি নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। ঈসা আঃ এর মুজিযাও এর ব্যতিক্রম নয়। ঈসা আঃ নিজেই বলেছেন, "আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না।" (যোহন/ ইউহোন্না ৫ : ৩০)
- ঈসা আঃ এর প্রধান শিষ্য পিতর বলেছেন, "নাসরতের ঈসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ আপনাদের মধ্যে মহৎ ও কেরামতি কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ করিয়েছেন যে, তিনি ঈসাকে পাঠিয়েছিলেন।" (প্রেরিত ২ : ২২)
- পাঠক লক্ষ্য করুন, বলা হচ্ছে, এসব কেরামতি বা মুজিযা ঈসা আঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ'ই ঘটিয়েছিলেন। তিনিই তাকে পাঠিয়েছিলেন। যার দ্বারা আল্লাহ ঘটিয়েছেন, যাকে তিনিই পাঠিয়েছেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহ হোন কিভাবে ?

মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি

- খৃষ্টানরা বলে, মৃতকে জীবিত করার দ্বারাই বোঝা যায় ঈসা খোদা ছিলেন। কিন্তু মৃতকে জীবিত করার মুজিযা তো অন্য নবীকেও দেওয়া হয়েছিলো, তাহলে তারা খোদা হতে পারলেন না কেন ? বাইবেলেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক বিধবার

একটি ছেলের মৃত্যু হলে এলীয় (ইলিয়াস) নবী তাকে জীবিত করেছিলেন। (১ রাজাবলি ১৭ : ২৩) রাজাবলি পুস্তকে আলইয়াসা (ইসাআ/ইলিশায়) নবীরও এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি এক শুনেমীয় স্ত্রীলোকের একটি মৃত ছেলেকে জীবিত করেছিলেন। (৪ : ৩৫)

- বরং লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঈসা আঃ এর চেয়েও বড় মুজিযা অন্য নবীকে দেওয়া হয়েছিলো। হযরত ইউসা আঃ এর আদেশে সূর্য আকাশের মাঝখানে গিয়ে থেমে গিয়েছিলো এবং অস্ত যেতে প্রায় পুরো একটা দিন দেরি করেছিলো। (বাইবেল, ইউসা ১০ : ১৩) আমাদের নবীর অঙ্গুলি মুবারকের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাও সুপ্রসিদ্ধ। হযরত আল ইয়াসা -এর মৃতকে জীবিত করার মুজিযা এতই শক্তিশালী ছিল যে, বাইবেলের বর্ণনানুসারে তার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর একটি লাশকে তার কবরে ফেলে দেওয়া হলে তার হাড়ের ছোঁয়া লাগা মাত্রই লোকটির লাশ জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। (২ রাজাবলি ১৩ : ২১)
- মৃত্যু অবস্থায় যে নবীর এতো ক্ষমতা, জীবিত অবস্থায় তার কি শক্তি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।
- কেউ কেউ আবার হযরত ঈসা আঃ এর বিনা পিতায় পয়দা হওয়াকে খোদা হওয়ার প্রমাণ বানিয়েছে। অথচ তা খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। পয়দা হওয়াটাই তো খোদা না হওয়ার বড় প্রমাণ। তাছাড়া আদম আঃ এরও তো পিতা-মাতা ছিলো না। ফেরেশতাদেরও তো পিতা-মাতা নেই। ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী শালেমের বাদশাহ মাল্কী সিদ্দীকেরও কোন মা-বাবা ছিল না। (ইব্রানী ৭ : ১-৩) তাহলে তো এদেরকেও খোদা বলতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)
- ইঞ্জিলে আছে, হযরত ঈসা আঃ বলেছেন, “যিনি আমার ও তোমাদের আল্লাহ, আমি উপরে তার করছে যাচ্ছি।” (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না/যোহন ২০ : ১৭) তাহলে কি আল্লাহ’রও আল্লাহ আছে ?

- **ঈসা আঃ শুধু বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেনঃ কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা**
- কুরআন শরীফে অনেক বিষয়ের মতো আরো একটি বিষয় আছে যা খৃষ্টানরা মানে না। তা হলো হযরত ঈসা আঃ পৃথিবীর সমস্ত জাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হননি। বরং তিনি কেবল বনী ইসরাঈল বা ইহুদী জাতির নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। (- সূরা সফফ, ৬)
- শুধু কুরআনেই নয়, বর্তমান ইঞ্জিলেও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ঈসা বনী ইসরাঈল জাতির নিকটে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন –

- (১) ঈসা বললেন, "আমাকে কেবল ইসরাঈল বংশের হারান মেষদের নিকটেই পাঠানো হয়েছে।" (মথি ১৫ : ২৪)
- উল্লেখ্য, হারান মেষ বলতে এখানে পথ-হারা ইহুদীদেরকেই বোঝানো হয়েছে।
- (২) ঈসা আঃ সেই বারজনকে এই আদেশ দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অ- ইহুদীদের কাছে বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যেয়ো না, বরং ইসরাঈল জাতির হারান মেষদের কাছে যেয়ো।" (মথি ১০ : ৫, ৬)
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেই যেখানে হযরত ঈসা আঃ তার শিষ্যদেরকে অ-ইহুদীদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন, সেখানে তার শুভাগমনের পর এহেন দাওয়াত দানের বৈধতার তো কোন প্রশ্নই আসে না।
- বর্তমান ইঞ্জিলে উল্লেখিত তথ্য দ্বারা জানা যায় যে, ঈসা আঃ কে যে ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছিলো, যা বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও নেই তাও কেবল বনি ইসরাঈল বা ইহুদীদের জন্য ছিলো। ইঞ্জিলের ইব্রানী অংশে বলা হয়েছে, "প্রভু বলেন, দেখো, সময় আসছে যখন আমি ইস্রায়েল ও এহুদার লোকদের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করবো।" (৮ : ৮)
- কয়েক লাইন পর আবার বলা হয়েছে, "ইস্রায়েলীয়দের জন্য আমি এই ব্যবস্থা স্থাপন করবো।" (৮ : ১০)
- এখানে নতুন ব্যবস্থা বলতে সকল খৃষ্টানদের মতে ইঞ্জিলকে বোঝানো হয়েছে। ইস্রায়েল ও এহুদা ইহুদীদেরই দুটি গোষ্ঠী।
- তাহলে কুরআন নাযিলের পূর্বেই যে বাইবেল (তাওরাত ও ইঞ্জিল) কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য নাযিল হয়েছিলো, বিশ্ব-মানবের হেদায়াতের আলোকবর্তিকা আল কুরআন নাযিল হওয়ার পরও সেই বাইবেলের প্রতি দাওয়াত দেওয়া কি অনধিকার চর্চা নয় ?

ঈসা শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেনঃ কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা

কুরআনের আরো একটি কথা খৃষ্টানরা অমান্য করে চলছে, তা হলো ঈসা আঃ বলেছেন, "আমি আমার পরের এমন একজন 'রাসুল' এর সুসংবাদ দাতারূপে আগমন করেছি যার নাম আহমদ।" (- সূরা সাফফ, ৬)

শুধু কুরআনেই নয় বর্তমানের ইঞ্জিলেও আছে যে, হযরত ঈসা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন –

(১) সেই সময় থেকে ঈসা এই বলে প্রচার করতে লাগলেন, "পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ বেহেশতী রাজ্য নিকটে এসেছে।" (মথি, ৪ : ১৭)

খৃষ্টানদের দাবি হলো বেহেস্তী রাজ্য বলে ঈসা আঃ এর যুগকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাদের এ দাবি অমূলক। কারণ ঈসা আঃ এর যুগকে বোঝানো হলে বলা হতো, "বেহেস্তী রাজ্য এসে গেছে।" তাছাড়া ঈসা আঃ তার শিষ্যদেরকে এভাবে মুনাজাত করতে শিখিয়েছিলেন, "হে আমার বেহেস্তী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক।" (মথি ৬ : ৯, ১০)

এ থেকেও বোঝা যায় উক্ত রাজ্য ঈসা আঃ এর যুগে আসেনি। সুতরাং এতে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগকেই বোঝানো হয়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার আমলেই এই পৃথিবীতে বেহেস্তী পরিবেশ ও স্বর্গসুখ নেমে এসেছিলো। তার শত্রুমিত্র সকলে অকপটে তা স্বীকার করবেন।

(২) ইহুদীদের উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা বলেছিলেন, "এজন্য আপনাদের বলছি, খোদার রাজ্য আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এমন লোকদের দেওয়া হবে যাদের জীবনে সেই রাজ্যের উপযুক্ত ফল দেখা যাবে। যে সেই পাথরের উপর পড়বে সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং সেই পাথর যার উপর পড়বে সে চুরমার হয়ে যাবে।" (মথি ২১ : ৪৩, ৪৪)

এখানে যে মহানবী ও সাহাবীদের কথা বলা হয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। তিনিই এমন পাথর ছিলেন, যে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। আবার তিনি যার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন সে-ই খতম হয়ে গেছে। সাহাবীগণই এমন মানুষ ছিলেন যাদের জীবনে বেহেস্তী রাজ্যের ফল দেখা দিয়েছিল। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা আঃ এমন ছিলেন না, ইঞ্জিলের ভাষ্য অনুসারে তাকে তো শত্রু-ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিলো। অবশেষে খৃষ্টানদের মতে শূলে বিদ্ধ করা হয়েছিলো। আর মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিলো। কুরআন হাদিসে স্পষ্টভাবে এটিই বর্ণিত হয়েছে।

(৩) ঈসা আঃ তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না। কারণ দুনিয়ার কর্তা আসছেন। আমার মধ্যে তার কিছুই নেই।" (ইউহোন্না/যোহন, ১৪ : ৩০)

উল্লেখ্য যে, শেষ বাক্যটি অর্থাৎ আমার মধ্যে তার কিছুই নেই কথাটি বাংলা ইঞ্জিলে বিকৃতরূপে তুলে ধরা হয়েছে। একটু পরেই পাঠক তা সবিস্তারে জানতে পারবেন।

যাহোক, কুরআন ও ইঞ্জিলের এসব স্পষ্ট হুকুম উপেক্ষা করে খৃষ্টান জগৎ আজ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে অমান্য করে আসছে। শুধু তাই নয়, তারা তার ব্যাপারে কটূক্তি করতেও কোনরূপ দ্বিধাবোধ করে না। কবি আফজাল চৌধুরী অনূদিত বার্ণাবাসের বাইবেলের ভুমিকায় অনুবাদক উল্লেখ করেছেন যে, "একদল মিশনারী তার কলেজে এসে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিলে তিনি মহানবী ও তার অবদান সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরেন। এতে

ফস করে একজন বলে ফেললেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন ভণ্ড নবী।" (নাউযুবিল্লাহ)

অবিকৃত কালাম একমাত্র কুরআন, বাইবেল বিকৃত

খৃষ্টানদের প্রচারিত একাধিক পুস্তকে (যেমন, আল্লাহ'র চিরন্তন কালাম, রদবদল, সোজা পথ, আপনার কাছে আমার মনের কথা) আরেকটি কথা খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করা হচ্ছে যে, তওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি আসমানী কিতাব সব অবিকৃত রয়েছে। আর এর প্রমাণস্বরূপ কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ তারা পেশ করছে। তা হলো "আল্লাহ'র কালাম পরিবর্তনকারী কেউ নেই।" – সূরাহ আনআম, ১১৫।

অথচ উক্ত আয়াতে আল্লাহ'র কালাম বলতে কুরআন শরীফকে বোঝানো হয়েছে। আর এটি সকলেরই জানা যে, কুরআন নাযিলের পর থেকে কেউ এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। একটি হরফ বা নুকতাও কেউ বদলাতে পারেনি।

উক্ত আয়াতে যে তওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতিকে বোঝানো হয়নি তার বড় প্রমাণ হলো খোদ কুরআনেই ওগুলোতে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান আছে। খৃষ্টানরা সেসব আয়াত দেখে না। কারণ তারা তো মতলববাজ। এখানে দুএকটি আয়াতের অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) "তারা (ইহুদীরা) কালামকে (তওরাতকে) তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে।" – সূরাহ মায়েদা, ১৩।

(২) "তাদের মধ্যে এমন কতক লোকও গত হয়েছে যারা আল্লাহ'র কালাম শুনতো, তারপর বুঝবার পর সেটাকে বিকৃত করতো।" – সূরাহ বাকারাহ, ৭৫।

(৩) "সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখতো এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলতো, এটা আল্লাহ'র নিকট থেকে অথচ তা আল্লাহ'র নিকট থেকে ছিল না।" – সূরাহ বাকারাহ, ৭৯।

বাইবেলে বিকৃতি ঘটার কথা শুধু কুরআনই বলছে না, বাইবেলেও একই কথা বলছে ইয়ারমিয়া/যিরমিয় পুস্তকে বলা হয়েছে, "তোমরা আমাদের জীবন্ত খোদার বাণীকে বিকৃত করে ফেলেছো।" – ২৩ : ৩৬

উল্লেখ্য যে, উক্ত পদটির অনুবাদ ইংরেজি ও উর্দু বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলা অনুবাদে এর অনুবাদেও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

খৃষ্টান পণ্ডিতদের মধ্যে সেন্ট অগাস্টিন, জাস্টিন, ইউসিবিয়াস, ওয়াটসন, হোয়াইটেকার, এডম ক্লার্ক, হর্ন ও ফানডর প্রমুখ বাইবেলে অনেক বিকৃতি ঘটার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানে আমি বিকৃতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিঃ

(১) বাইবেলে এক জায়গায় বলা হয়েছে, "অহসিয় বাইশ বছর বয়সে রাজত্ব করা আরম্ভ করেন।" (দ্র. ২ রাজাবলি ৮ : ২৬)
অন্যত্র বলা হয়েছে, "৪২ বছর বয়সে রাজত্ব করা আরম্ভ করেন।" (দ্র. ২ বংশাবলি ২২ : ২)
(২) এক স্থানে বলা হয়েছে, "যিহোয়াযীন আঠারো বছর বয়সে রাজত্ব আরম্ভ করেন।" (দ্র. ২ রাজাবলি ২৪ : ২৮)
অন্যত্র বলা হয়েছে, "আট বছর বয়সে রাজত্ব আরম্ভ করেন।" (দ্র. ২ বংশাবলি ৩৬ : ৯)
(৩) এক স্থানে দাউদ আঃ এর সেনাসংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তলোয়ার চালানোর মতো ইসরাঈলে রয়েছে আট লক্ষ, আর এহুদাতে রয়েছে পাঁচ লক্ষ।" (দ্র. ২ শামুয়েল ২৪ : ৯)
অন্যত্র বলা হয়েছে, "তলোয়ার চালানোর মতো ইসরাঈলে আছে এগারো লক্ষ, আর এহুদায় চার লক্ষ।" (দ্র. ১ বংশাবলি ২১ : ৫)
(৪) ইঞ্জিল শরীফের এক স্থানে বলা হয়েছে, "ঈসা আঃ এর পিতার নাম ইউসুফ, ইউসুফের পিতা ইয়াকুব, তার পিতা মত্তন, মত্তনের পিতা ইলিয়াসর।" (দ্র. মথি ১ম অধ্যায়)
অন্যত্র বলা হয়েছে, "ঈসার পিতা ইউসুফ, তার পিতা এলি, এলির পিতা মত্তত, তার পিতা লেবী।" (দ্র. লুক ৩য় অধ্যায়)
একইভাবে মথির ইঞ্জিলে আছে, ঈসা আঃ দাউদ আঃ এর পুত্র হযরত সুলাইমান আঃ এর বংশধর ছিলেন। কিন্তু লুকের ইঞ্জিলে আছে, "তিনি দাউদের পুত্র নাথনের বংশধর ছিলেন।"
(৫) ইঞ্জিলের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "এহুদা রুপার টাকাগুলো নিয়ে এবাদতখানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলো এবং গলায় দড়ি দিয়ে মরল। ইমামেরা সেই টাকা দিয়ে বিদেশীদের কবরস্থানের জন্য কুম্ভকারের জমি কিনলেন।" (দ্র. মথি ২৭ : ৫-৮)
অন্যত্র বলা হয়েছে, "টাকাগুলো দ্বারা এহুদা এক খণ্ড জমি কিনল, আর সেখানে পড়ে তার পেট ফেটে গেলো এবং নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে পড়লো।" (দ্র. প্রেরিত ১ : ১৮)
এসব স্ববিরোধী বক্তব্যের একটা অবশ্যই মিথ্যা ও বিকৃত। বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তির সংখ্যা কোন কোন খৃষ্টান পন্ডিতের মতে পঞ্চাশ হাজার। কেউ কেউ বলেছেন ত্রিশ হাজার।
ভুল-ভ্রান্তি তো পরের কথা, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তককে এতদিন মুসা আঃ এর লেখা তওরাত বলে দাবি করা হতো। এখন পণ্ডিতরা বলছেন, এটা আদৌ মুসা আঃ এর তওরাত নয়। এর লেখক অন্য কেউ।
ড. মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান গ্রন্থে বলেছেন, "তওরাত যে হযরত মুসার রচনা নয়, এ বিষয়ে এখন আর কারো কোন দ্বিমত নেই।" (দ্র. পৃ .২৪)
এমনিভাবে যে ইঞ্জিল শরীফ তারা প্রচার করে আসছে, এটা ঈসা আঃ এর উপর নাযিল হওয়া ইঞ্জিলই নয়। এটা মূলত ঈসা আঃ এর জীবনীগ্রন্থ। এতে তার জন্ম থেকে কথিত মৃত্যু, কবর দেওয়া ও তিনদিন পর কবর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত দিক তুলে ধরা হয়েছে।

বাইবেলের অনুবাদে বিকৃতি

অনুবাদের হেরফের, ভুল ও বিকৃতিতে ভরা বর্তমান বাইবেলটিও লক্ষ্য করার মতো। এখানে এরও কিছু নমুনা তুলে ধরছি।

(ক) বাইবেলের "দ্বিতীয় বিবরণী" পুস্তকের ৩৩ নং অধ্যায়ের ২ নং পদটি প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদে এভাবে আছে – And he came with ten thousands of sainth. অর্থাৎ, তিনি দশ হাজার পবিত্র লোক নিয়ে আসলেন। এ পদটির ব্যাপারে বাইবেল ভাষ্যকারগণ একমত যে, এখানে একজন নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

মুসলিম গবেষকদের মতে এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ একমাত্র তার সঙ্গেই বিদায় হজ্জের সময় দশ হাজার সাহাবী ছিলেন।

খৃষ্টানরা যখন দেখলো এ "দশ হাজার" কথাটি তাদের জন্য অসুবিধাজনক, তখন তারা উক্ত পদটির অনুবাদে যে আশ্চর্য বিকৃতি ঘটিয়েছে তা দেখার মতো।

বাংলা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "(তিনি) অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন।" কিতাবুল মুকাদ্দাস নামে বাইবেলের নতুন বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে, "তিনি লক্ষ লক্ষ পবিত্র ফেরেশতাদের মাঝখান থেকে আসলেন।"

লক্ষ করুন, কিভাবে দশ হাজার লক্ষ লক্ষ হয়ে গেলো এবং "পবিত্র লোকের সঙ্গে আসা" কথাটি কিভাবে "পবিত্র ফেরেশতাদের মাঝখান থেকে আসা"য় পরিণত হলো !!

(খ) ইঞ্জিল শরীফের যোহন (ইউহোন্না) অংশে ১৪ নং অধ্যায়ের ৩০ নং পদটিতে ঈসা আঃ এর উক্তি এভাবে আছে, "আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলবো না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।"

এ অনুবাদ বাংলা পবিত্র বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদও অনুরূপ। উর্দু অনুবাদে শেষ বাক্যটি এভাবে আছে – (উর্দু টাইপ করতে পারছি না) অর্থাৎ, আমার মধ্যে তার কিছুই নাই।

আলেমগণ বলেছেন, এখানে ঈসা আঃ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কেই জগতের অধিপতি বলেছেন এবং নিজেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তুলনায় ক্ষুদ্র হিসেবে তুলে ধরেছেন।

খৃষ্টানরা উক্ত অনুবাদে নিজেদের অসুবিধা দেখে শেষ বাক্যটির অনুবাদ বদলে দিয়েছে। কিতাবুল মুকাদ্দাস নামে বাইবেলের নতুন বাংলা অনুবাদে এবং বাংলা ইঞ্জিল শরীফে শেষ বাক্যটির অনুবাদে বলা হয়েছে, "দুনিয়ার কর্তা আসছে। আমার উপরে তার কোন অধিকার নেই।"

লক্ষ্য করুন, “দুনিয়ার কর্তা আসছে” কথাটির সাথে “আমার উপরে তার কোন অধিকার নেই” কথাটির কি কোন মিল আছে ?

(গ) ইঞ্জিল শরীফে (‘মথি’ এর অংশে) ১৯ নং অধ্যায়ের ১৬, ১৭ নং পদটি প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদে এভাবে আছে – one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life ? And he said unto him why callest thoo me good ? there is none good but one, that is god. অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে (ঈসা আঃ কে) বলল, “হে ভালো গুরু, অনন্ত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে ভালো কি করতে হবে ? তিনি তাকে বললেন, আমাকে তুমি ভালো বলছ কেন ? একজন ছাড়া ভালো কেউ নেই, তিনি হলে আল্লাহ।”

এই অনুবাদের আলোকে যেহেতু ঈসা আঃ এর খোদা হওয়ার ধারণাটি (যা খৃষ্টানরা পোষণ করে থাকে) সমূলে বিনাশ হয়ে যায় – কারণ ঈসা আঃ তাকে ভালো বলতেও নিষেধ করেছেন; তিনি বলেছেন, ভালো একমাত্র আল্লাহ তাআলা – তাই খৃষ্টানরা উক্ত পদদুটির অনুবাদে বিকৃতি ঘটিয়েছে।

বাংলা ইঞ্জিল শরীফে পদ দুটির অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, “আর একজন যুবক এসে ঈসাকে বললেন, হুযূর, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে ভালো কি করতে হবে ? তিনি তাকে বললেন, ভালোর বিষয়ে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছো। ভালো মাত্র একজনই আছেন।”

লক্ষ্য করুন, শেষে গড বা আল্লাহ কথাটিও বাদ দেওয়া হয়েছে এবং “আমাকে ভালো বলছো কেন” কথাটিকে বিকৃত করে কিভাবে “ভালোর বিষয়ে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো” কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

খৃষ্টানরা বলে, বাইবেলের হাজার হাজার কপি তিন মহাদেশ তথা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিলো। কুরআন নাযিলের বহু পূর্বেকার একাধিক পান্ডুলিপি পৃথিবীর বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সুতরাং এতে বিকৃতি ঘটার প্রশ্নই আসে না।

এ কথাগুলোও তাদের একটি বড় ধোঁকা। কারণঃ

(ক) হাজার হাজার কপি তিন মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা ইদানীংকালের ব্যাপার। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পরের ঘটনা। মুসা আঃ এর পর থেকে ঈসা আঃ পর্যন্ত ইহুদীরা কেবল ইসরাঈল ও এহুদা এদুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই বসবাস করতো। এর বাইরে সব দেশেই পৌত্তলিকতার ছড়াছড়ি ছিলো। ইসরাঈল ও এহুদা রাষ্ট্রদুটির বাসিন্দা ইহুদীদের মাঝেও আবার প্রায়ই দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকতো। যার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলেই রয়েছে। (দ্র. রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তক)

- (খ) এক সময় বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অস্তিত্বই পৃথিবীতে বাকি ছিলো না। মুসা আঃ তওরাত শরীফ একটি সিন্দুকে ভরে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন বিভিন্ন পর্বের সময় সেটিকে পাঠ করতে। কিছুকাল পর সেটি সিন্দুক থেকে গায়েব হয়ে যায়।
- শত শত বছর পর্যন্ত গায়েবই ছিলো। এ সময় ইহুদীদের অনেক রাজা-বাদশাহ পৌত্তলিকতা অবলম্বন করে। ফলে তওরাতের প্রতি তাদের কোন আগ্রহও ছিলো না। কালক্রমে ইউসিয়া নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তার একান্ত ইচ্ছা ছিলো তওরাত অনুসারে চলবার। কিন্তু তার রাজত্বের সতের বছরে কেউ কোথাও তওরাত খুঁজে পায়নি। আঠারোতম বছরে হঠাৎ করে হিল্কিয়া যাজক দাবি করে বসলো বায়তুল মুকাদ্দাসে তওরাত খুঁজে পাওয়ার। (দ্র. ২ রাজাবলি/বাদশাহনামা ২২ : ৮)
- অথচ ঐ বায়তুল মুকাদ্দাসে উক্ত বাদশাহ'র সতের বছর সময়ে সকাল-সন্ধ্যা শত শত মানুষ প্রবেশ করেছে। তাদের কারো চোখেই তওরাত ধরা পড়েনি। পরবর্তী কালে ব্যাবিলন সম্রাট বখতে নসরের হামলায় যাজক কর্তৃক আবিষ্কৃত তওরাতটিও ধ্বংস হয়ে যায়। ইহুদীরা দাবি করে পরবর্তীকালে নাকি উযায়র আঃ তাওরাত পুনঃ রচনা করেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই।
- (গ) ঈসা আঃ এর পরেও বাইবেলের হাতেগোনা কিছু কপি ছিলো। আরো পরে সেটি পোপদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। সাধারণ লোকের জন্য বাইবেল পড়া, এর অনুবাদ করা নিষিদ্ধ ছিলো।
- প্রথম প্রথম এর অনুবাদকারীদের উপর পোপ ও তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড়ও বয়ে গিয়েছিলো। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে উইক্লিফ (Wycliff) নামক জনৈক খৃষ্টান পণ্ডিত এর সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

- (ঘ) বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত যে সব পান্ডুলিপির ব্যাপারে দাবি করা হয় যে, সেগুলো কুরআন নাযিলের পূর্বেকার, সেগুলোর সন-তারিখ নিয়ে খৃষ্টান পণ্ডিতদের মাঝেই মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ সেগুলো দশম শতাব্দীর পূর্বের নয় বলে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু সেগুলো ছিলো কাগজে লেখা কপি, তাই কাগজের আয়ু ও স্থায়িত্বকাল উক্ত মতকেই সমর্থন করে বৈকি। তাছাড়া ঐ কপিগুলোর গবেষক যারা তারাও বলেছেন সেগুলোর মধ্যে অনেক তারতম্যের কথা। এতো পুরাতন পাণ্ডুলিপির কথায় যেয়ে লাভ নেই।

- এই তো মাত্র ১৯৫২ সালে নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত "রিভাইজড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভার্সন" নামে যে বাইবেলটি ছাপা হয়েছে, সেটির সঙ্গে পূর্বের বাইবেলগুলোর অনেক গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে খোদ খৃষ্টানদের তরফ থেকেই এর বিরুদ্ধে অনেক চেঁচামেচি করতে শোনা গেছে।

তওরাত অবিকৃতঃ ভ্রান্ত দাবি

- খৃষ্টানদের আরেকটি দাবি হলো আল্লাহ'র মতো তার কালামও চিরন্তন। এতে কোন ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে না। কুরআন শরীফ পূর্বের কোন কিতাবকে বাতিল করেনি। নবীদের দেওয়া বার্তাও চিরন্তন ও পরিবর্তনহীন। কারন এর উৎপত্তিস্থল স্বয়ং আল্লাহ, কোন মানুষ নয়।

এ দাবির প্রমাণস্বরূপ তারা মথি লিখিত ইঞ্জিলে উল্লেখিত ঈসা আঃ এর একটি উক্তি তুলে ধরছে।

তিনি বলেছেন যে, "এই কথা মনে করো না যে, আমি তওরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি। বরং পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আসমান ও জমিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না তওরাত কিতাবের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সেই তওরাতের একটি বিন্দু কি একটি মাত্রাও মুছে যাবে না।" (মথি ৫ : ১৭-১৮)

তাদের উক্ত দাবি একান্তই ভুল। কারণঃ

(ক) আল্লাহ তাআলা যখন কোন নতুন শরীয়ত নাযিল করেছেন, তখনি পূর্বের কিছু বিধি-বিধানকে রহিত করে দিয়েছেন। খোদ বাইবেলের মধ্যেও এমন কিছু কিছু বিষয়কে হারাম করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে হালাল ছিলো। যেমন বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করা, তওরাতে হারাম করা হয়েছে। (দ্র. লেবীয় পুস্তক ১৮ : ৯)

অথচ পূর্বে তা বৈধ ছিলো। ইব্রাহীম আঃ যে তার বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করেছিলেন সে কথা বাইবেলেই উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্র. আদিপুস্তক ২০ : ১২)

অথচ মুসা আঃ এর শরীয়তে তা হারাম করা হয়েছে। (দ্র. লেবীয় পুস্তক ১৮ : ৯, ২০ : ১৭, দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ : ২২)

এমনিভাবে আপন দুবোনকে একই সঙ্গে বিবাহ করা ইয়াকুব আঃ এর শরীয়তে বৈধ ছিলো। (দ্র. আদি পুস্তক ২৯ : ২৩-৩০)

কিন্তু মুসা আঃ এর শরীয়তে তা হারাম করা হয়েছে (দ্র. লেবীয় পুস্তক ১৮ : ১৮)

এমনিভাবে শুকরসহ অনেক প্রাণী খাওয়া মুসা আঃ এর শরীয়তে হারাম ছিলো। অথচ ঈসায়ী শরীয়তে শুকরসহ এর অনেকগুলোই হালাল বলে খৃষ্টানরা দাবি করছে।

- (খ) যদি পূর্বের কিতাব পুরোপুরি ঠিক থাকে, তার বিধানগুলোও চালু থাকে, তবে ইঞ্জিলেরই বা দরকার কি ছিলো ? তওরাত অনুসারে আমল করাই তো যথেষ্ট হতো।
- (গ) মুসলমানরা কখনোই বলেনি পূর্বের কিতাবসমূহ বাতিল হয়ে গেছে; বরং তারা বলে পূর্বের অনেক বিধান রহিত হয়ে গেছে। খৃষ্টানরাই বরং দাবী করছে যে, পূর্বের কিতাব বাতিল হয়ে গেছে। এখন মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলছে আল্লাহ'র মতো তার কালামও চিরন্তন। যাতে মুসলমানরা তাদের ধোঁকায় পড়ে ভুয়া ইঞ্জিলকে আল্লাহ'র চিরন্তন কালাম বলে স্বীকার করে। ইঞ্জিলের ইবরানী অংশে বলা হয়েছে, "ইমামের পদ বদলানো হয় তখন শরীয়তও বদলাবার দরকার হয়।" (৭ : ১২)

অন্যত্র বলা হয়েছে, "মুসার শরীয়ত কোন কিছুকেই পূর্ণতা দান করতে পারেনি। তাই আগে যে শরীয়ত ছিলো তা দুর্বল ও অকেজো বলে বাতিল করা হয়েছে।" (৭ : ১৮)

উল্লেখ্য যে, এই পদটির ভুল অনুবাদ করা হয়েছে বাংলা ইঞ্জিল শরীফ ও বাংলা কিতাবুল মুকাদ্দাসে, আমরা প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদ, উর্দু অনুবাদ ও পবিত্র বাইবেল নামে যে বঙ্গানুবাদ আছে তার আলোকে সঠিক অনুবাদ তুলে ধরছি।

অন্যত্র বলা হয়েছে, "প্রথম ব্যবস্থাটা যদি নিখুঁত হতো তবে তো দ্বিতীয় ব্যবস্থার কোন দরকার হতো না। আল্লাহ এই ব্যবস্থাকে নতুন ঘোষণা করে আগের ব্যবস্থাকে পুরনো বলে অচল করে দিলেন। যা পুরনো এবং অনেক দিনের বলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে।" (৮ : ৭, ১৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে, "ঈসা তার ক্রুশের উপর মেরে ফেলা দেহের মধ্য দিয়ে সমস্ত হুকুম ও নিয়মশুদ্ধ মুসার শরীয়তের শক্তি বাতিল করিয়াছেন।" (ইফিষী ২ : ১৫)

এখানে পুরনো ব্যবস্থা বলে মুসা আঃ এর শরীয়ত তথা তওরাতকে এবং নতুন ব্যবস্থা বলে ইঞ্জিলকে বোঝানো হয়েছে।

এবারে পাঠক লক্ষ্য করুন, কিভাবে তারা মুসা আঃ এর শরীয়ত ও তওরাতকে অকেজো, অচল, বাতিল ইত্যাদি দোষে জর্জরিত করেছে। আর মুসলমানদেরকে বোঝাচ্ছে আল্লাহ'র মতো তার কালামও চিরন্তন। এটাকেই কি ধোঁকাবাজি ও চালবাজি বলে না ?

- (ঘ) আল্লাহ'র মতো তার কালাম যদি সত্যিই চিরন্তন হয়, তবে কুরআন কি দোষ করেছে ? আল্লাহ'র সর্বশেষ কালাম হিসেবে কুরআন কি অনুসরণের উপযুক্ততা রাখে না ? তাহলে খৃষ্টানরা কেন কুরআনের অনুসারীদেরকে খৃষ্টান বানানোর জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে ?

সকলের গুনাহ'র মার্জনাস্বরূপ মাসীহ আঃ এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া

- খৃষ্টানরা তাদের প্রচারিত পুস্তিকাগুলোতে আরেকটি কথা খুব জোর-তাগিদের সাথে প্রচার করছে যে, আমরা সবাই গুনাহগারের সন্তান, আমরা সবাই গুনাহ করেছি। আমাদের ক্ষমা দরকার। দরকার আল্লাহ'র রহমতের। তাই একজন মধ্যস্থতাকারী দরকার। ঈসা মসীহই সেই মধ্যস্থতাকারী।

এসব কথার মধ্যে তারা মূলত তাদের পাপমোচন বিশ্বাসকে তুলে ধরছে। যার সারকথা হলো, প্রথম মানব হযরত আদম আঃ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে যে মহাপাপ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) বংশানুক্রমে সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে সে পাপ বিস্তার লাভ করে। পাপের ফল মৃত্যু। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু দয়াময়, তাই সকল মানুষকে এই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে তিনি তার নিস্পাপ ঈসা মাসীহকে মানব জাতির পক্ষ থেকে মৃত্যুবরণ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঈসা মাসীহ ক্রুশে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সমস্ত মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি দেন। আদম থেকে শুরু করে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত আসল গুনাহ থেকে তিনি মানবজাতিকে পরিত্রাণ দান করেন। তাই তিনি ত্রাণকর্তা।

এ হলো খৃষ্টানদের বিশ্বাস। সেন্ট অগাস্টাইনসহ অনেক খৃষ্টান পন্ডিত এর উপর সবিস্তার আলচনা করেছেন।

কিন্তু মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত আদম আঃ গুনাহ করেননি। নিষিদ্ধ ফল খাওয়া তার একটি পদস্খলন ছিলো। কুরআনের বর্ণনায় তওবা করে তাও তিনি আল্লাহ'র কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং তার বংশধরদের মধ্যে তা সংক্রমিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

- সমস্ত নবী-রাসুল ছিলেন নিস্পাপ। এটিই মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস। তারা খৃষ্টানদের মতো বিশ্বাস করে না যে, নূহ আঃ মদ পান করে উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন বা লূত আঃ মদ পান করে আপন দুই মেয়ের সঙ্গে দুই রাতে সহবাস করেছিলেন বা সুলাইমান আঃ তার বিদেশী স্ত্রীদের প্ররোচনায় দেবদেবীর পূজা করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)
- কুরআন হাদিসের আলোকে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, পাপ যতো বেশী ও কঠিনই হোক, তওবার দ্বারা তা মাফ হয়ে যায়। বাইবেলের হিজকিল/যিহিস্কেল পুস্তকেও তা-ই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "যদি একজন দুষ্ট লোক তার সব গুনাহ থেকে ফিরে আমার সব নিয়ম-কানুন পালন করে আর ন্যায় ও ঠিক কাজ করে তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচবে, মরবে না। সে যেসব অন্যায় করেছে তা আমি আর মনে রাখবো না।" (১৮ : ২১-২২)
- সুতরাং মুসলমানরা বিশ্বাস করে না যে, তওবার বাইরে গুনাহ মাফের জন্য কাউকে জীবন বিসর্জন দিতে হবে। বিসর্জন যদি দিতেই হয় তাহলে যে গুনাহ করেছে বা

করবে তারই দেওয়া উচিত। উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর মতো কোটি কোটি মানুষের গুনাহর জন্য নিরপরাধ একজনের জীবন দেওয়া কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

- কুরআন হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ইহুদীরা ঈসা আঃ কে শূলেও দিতে পারেনি, হত্যাও করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন। সুতরাং এর বাইরে মুসলমানরা বিশ্বাস করতে পারে না যে, ঈসা আঃ কে পাপ মোচনের জন্য শূলে চড়ানো হয়েছে।
- পরিশেষে মুসলমান ভাইদেরকে কুরআনের একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে আয়াতটির অর্থ হলো, "আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) দের অনেকেই চায় তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কাফেরে পরিণত করতে। এটা তাদের মনের হিংসার কারণে, তাদের কাছে সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর।" (সূরাহ বাকারাহ, ১০৯)
- স্পেনের ইতিহাস ভুলে যাবেন না। আটশো বছর মুসলমানরা শাসন করেছিলো সে দেশ। ইহুদীদের সহায়তায় খৃষ্টানরা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে দেশটি দখল করে। মসজিদে ঢুকেও মুসলমানরা রেহায় পায়নি।
- বৃটিশ বেনিয়াদের কথাও স্মরণ রাখবেন। ছলেবলে কৌশলে উপমহাদেশ দখল করে হাজার হাজার আলেমকে আন্দামানে নির্বাসিত করেছিলো। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধারের এমন কোন গাছ ছিলো না যেখানে কমপক্ষে একজন আলেমকে ফাঁসি না দেওয়া হয়েছিলো। বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও সর্বশেষ ইরাকে খৃষ্টানদের জুলুম-নির্যাতন সকলের সামনে। কিউবার গুয়ান্তানামো বে'তে কুরআন অবমাননার দুঃখ এখনো হৃদয়ে তপ্ত-তাজা। তবু কি আমাদের সম্বিৎ ফিরবে না ?[৫]

৪.খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধে আমাদের করণীয়

হক্ক ও বাতিলের সংঘাত চিরন্তন, দুনিয়ার বুক থেকে হক্কের দেদীপ্যমান আলোকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য তাগুতি শক্তি সদা সচেষ্ট। তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে ইসলাম ও মুসলমানের বিজয়ের পথকে বাধাগ্রস্ত করতে। মুসলমানদের বিপদগামী করে ধ্বংসের অতলান্তে নিমজ্জিত করার নিমিত্তে তাদের শয়তানী মিশনকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পরিচয়ে সক্রিয় রেখেছে।

খৃষ্টান মিশনারি এবং এনজিওরা সেই ইংরেজদের দালাল যারা ২০০ বছর ভারতবর্ষে শাসনের নামে শোষণ চালিয়েছিলো।বণিকবেশে ও বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে আগমন করে ভারতবর্ষ দখল করে এদেশের মানুষের উপর লোমহর্ষক, পাশবিক নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছিলো।যারা আজও ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, লিবিয়া ও আবু গারিব কারাগারে, গুয়ান্তানামো-বে কারাগারে নির্বিচারে মুসলমানদেরকে শহীদ করে দিচ্ছে। যারা এক সাগর রক্তের দ্বারা অর্জিত সোনার বাংলাকে খৃষ্টান রাজ্যে পরিণত করতে চায়।এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চায়। আমাদের বাংলাদেশে আরেকটি পূর্ব তিমুর রচনা করতে চায়।যারা আজ সারা বিশ্বের মোড়ল হয়ে দুনিয়া থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে শেষ করে দিতে চায়।

খৃষ্টান মিশনারির ধর্মান্তরের শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান চিরদিনের জন্য সরলপথ হারিয়ে জাহান্নামী হচ্ছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করে মুসলিম মনন-মস্তিস্ককে খৃষ্টবাদের ছাঁচে নেওয়ার কৌশল করছে। এমতাবস্থায় প্রিয় ছাত্রভাইদের কর্তব্য, মিশনারিগুলোর তৎপরতার অবগতি ও তা দূর করার পন্থা চর্চার মাধ্যমে তাদের খৃষ্টরাজ্য গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা এবং তাদের অপতৎপরতার গতিকে রুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে –

মিডিয়ায় সত্য প্রচার করা:মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা মিডিয়ায় অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হয়।

রাজনীতিবিদদের সতর্ক করাঃ খৃষ্টান মিশনারিগুলো এ দেশের রাজনৈতিক ফিল্ড নিজেদের দখলে আনার জন্য রাজনীতিবিদদের মগজ ধোলাই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তারা নেতাদের কাছে উপঢৌকন ও উপহার পেশ করে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং অর্থ-কড়ির মাধ্যমে স্বার্থ হাসিলের জোর তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। এর উৎকৃষ্ট নজির জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ফতোয়া বিরোধী রায় বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা। তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে আমাদের উচিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সরকারী বেসরকারি সিনিয়র কর্মকর্তা ও সব শ্রেণীর লোকদের উক্ত বিষয়ে সরাসরি ও চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করা।

লেখক দের কে উৎসাহিত করা: খৃষ্টান মিশনারিগুলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই লিখে প্রচার করছে। তার মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম-"গুনাহগারদের জন্য বেহেশতের পথ" (এই নামটির শুরুতে আরবিতে লেখা – "ত্বারিকুল জান্নাতি লিল মুযনিবি"), বেলালের লেখা "আপনার জন্য আমার অন্তরের কথা", "গুনাহ থেকে মুক্তির পথ", "কুরআনের আলোকে জান্নাতের পথ" ইত্যাদি। এগুলো হলো মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা খৃষ্টানদের বই।

কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কিংবা হিন্দুদের উদ্দেশ্যে লেখা কয়টি বই আছে আমাদের ?

আজ তারা আমাদের দেশের লেখকদের কিনে নিয়েছে আর তাদেরকে ভ্রান্ত মতবাদটি বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছে এবং বড় বড় লেখকদের কলম থেকে তাদের মতবাদ ও দাওয়াত প্রচার করাচ্ছে। আমাদের কর্তব্য সেই কলামিস্টদের কাছে গিয়ে ইসলামের হক্কানিয়াত তাদের সামনে উপস্থাপন করা। তাদের কে বোঝানো,আখিরাতের ফিকির করে, ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে আপনাকে ইসলামের পক্ষে লিখতে হবে ।

চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম নেতাদের চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন। আপনিও সেই সুন্নাত আদায়ের লক্ষ্যে দেশের অমুসলিম এম.পি. মন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করতে পারেন। আপনার চিঠিটা পাওয়া তাদের হক।

উলামায়ে কেরামের করণীয়

উলামায়ে কেরাম হলেন ধর্মীয় অভিভাবক। আর ধর্মীয় অভিভাবকদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। ছকে বাঁধা দ্বীনি খেদমতে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাদের শান নয়। সমাজের গভীরে অনুপ্রবেশকারী মিশনারি ও তাদের তাবেদার এনজিওদের অপতৎপরতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা তো তাদের ফরয কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লক্ষ কোটি উম্মত সমাজের মিশন-আখড়ায় বন্দী হয়ে খৃষ্টান জগতে পাচার হয়ে চিরতরে জাহান্নামে ঝাঁপ দিচ্ছে – এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা থাকা প্রয়োজন। যারা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অহর্নিশ মানবেতর জীবন যাপন করছে, যাদের রোগে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই, তাদের পাশে দাঁড়াবার মানসিকতা গড়ে উঠা আজ সময়ের দাবী।

কতো ভালো হতো, যদি উলামায়ে কেরাম নিন্ম বর্ণিত বিষয়ের প্রতিও মনোযোগী হতেন –

(১) সরাসরি খৃষ্টানদের দাওয়াত দেওয়া, বিশেষ করে যারা খৃষ্টধর্মের প্রচারক।

(২) ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি স্কুলের মোকাবেলায় মসজিদে মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে ইসলামিক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল কায়েম করা।

(৩) ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

(৪) অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের করণীয়

আল্লাহ আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ'র রাস্তায় খরচ করার জন্য। আজ খৃষ্টানরা যদি তাদের আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন আমাদের সত্য ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করতে পারবো না। আমাদের তো বরং দ্বীন প্রচারের জন্য প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

চট্টগ্রামের উলামায়ে কেরামদের প্রতি আমার আবেদন

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এই অঞ্চলকে "মাদখালুল ইসলাম" বা ইসলামের প্রবেশ পথ বলা হয়। এই পার্বত্য এলাকায় বাস করে ৪৫ টি জাতি গোষ্ঠীর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এতো কাছে হওয়া সত্ত্বেও বিশাল এই হিল বেল্টে আমরা ইসলামের আলো পৌঁছাতে পারিনি। অথচ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে খৃষ্টান মিশনারিগুলো এদেশে এসে পাহাড়ের ভিতরে জঙ্গলের গভীরে গিয়ে এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম ইত্যাদি উপজাতির হাজার হাজার মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে। সেখানে মসজিদ তৈরি হওয়ার পূর্বে খৃষ্টানদের গির্জা তৈরি হয়েছে। কি আশ্চর্য! চট্টগ্রামের মুসলমান যারা দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে পরিচিত তাদের চোখের সামনেই উপজাতি ভাইদেরকে – যাদের কোন ধর্ম নেই, মিশনারিরা খৃষ্টান বানিয়ে ফেলছে। বলতে হবে, এটা আমাদের ব্যর্থতা। পাহাড়ের ভিতর খৃষ্টানরা স্কুল বানিয়ে, ঘর নির্মাণ করে, খাদ্য দিয়ে তাদেরকে বিনামূল্যে অন্ন, শিক্ষা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা মাদ্রাসা ঘেঁষে আরেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছি, কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে কোনদিন একটি মাদ্রাসা বানানোর উদ্যোগ নেইনি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ফিকির নিয়ে এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন, আমীন।৬

এছাড়াও এমন পরিস্থিতিতে মুসলমান হিসেবে ঈমানী দায়িত্ব থেকে আমাদের যা করণীয় বা বাস্তবতার ভিত্তিতে যে উপযোগী কৌশল ও শর'ঈ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

(১) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।

(২) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দ্বীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।

(৩) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।

(৪) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৫) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।

(৬) প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দ্বীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব সু-প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(৭) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(৮) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।

(৯) ইসলামের সত্যতা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আল কুরআনের ভাষাগত মোজেজা, ভাষাগত অসাধারণত্ব মানুষকে বোঝানো। কুরআন কত নিখুঁতভাবে এবং অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে সেই ইতিহাস বিস্তারিতভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা। কারণ এরমধ্যে ইসলামের সত্যতা লুকিয়ে আছে আল কুরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বাণী কিভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও মানুষকে জানানো।

(১০) সাধ্যমত আদব ও ভদ্রতার সাথে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। নিজেদের অভ্যন্তরীণ ছোটখাটো মতভেদ নিয়ে শত্রুতায় লিপ্ত না হয়ে ,আমাদের চোখের সামনে যে মুসলিম ভাই বোনগণ মুরতাদ হয়ে যাচ্ছেন সেই বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা। কোন মুসলিম ভাই বা বোন যদি মুরতাদ হয়ে যান তাহলে তাকে ভালোবেসে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

উপসংহার: আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য ।আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দেয়ার জন্য দাঈ হিসেবে। কিন্তু আমরা আজ আমাদের

উদ্দেশ্য ভুলে গেছি বরং এখন আমাদেরকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে খ্রিস্টবাদের দিকে । মুসলিমদের বানানো হচ্ছে খ্রিস্টান। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো খ্রিস্টানরা যেন বাঁশি বাজিয়ে মানুষকে তাদের অনুগত করছে। দলে দলে মানুষ সেই বাঁশিতে ধর্ম ছাড়ছে। এই বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় গির্জা গেড়ে অনবরত তারা বাজিয়ে যাচ্ছে ধর্মান্তকরণের বাঁশি।সর্বোপরি তারা

ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশ করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দুঃসাহসিক পদযাত্রা রোধ করতে না পারলে গোলামীর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, জাতি হিসেবে আমরা নিক্ষিপ্ত হবো ইতিহাসের আঁস্তাকুড়।

উল্লিখিত খ্রিস্টান তৈরির অপকৌশল ব্যতীত তাদের আরো বহু অপকৌশল রয়েছে।এই অল্প পরিসরে তাদের সবগুলো অপকৌশল বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের থেকে সতর্ক করাই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত তাদের প্রকৃত অবস্থা তো তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বিধৃত করেছেন এ বলে যে,

﴿وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

“আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে) কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল অতি উত্তম।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢﴾ [التوبة: ٣٢]

“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা বিধান করা ব্যতীত অন্য কিছু চান না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩২]

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততাকে একত্রিত করে দেন, তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে সুদৃঢ় করেন, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং প্রশান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন, পক্ষান্তরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রদান

করেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় দয়াবান।

হে আল্লাহ! যে কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে তার নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত রাখো, তার ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ফিরিয়ে দাও এবং তার সকল অনিষ্ট পোষণের গন্ডি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনা কারী এবং তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

তথ্যসূত্র

১.মাওলানা মুফতী যুবায়ের,বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দাঈ,সূত্রঃ পয়গামে সুন্নত ১৪৩১-৩২ হিজরি ।আর্টিকেলটি নেওয়া হয়েছে এই বই থেকে – মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল]

২.মাওলানা মুফতী যুবায়ের,বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দাঈ,সূত্রঃ পয়গামে সুন্নত ১৪৩১-৩২ হিজরি ।আর্টিকেলটি নেওয়া হয়েছে এই বই থেকে – মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল]

৩. বই- বাংলায় বাজে গির্জার বাঁশি,লেখক-ওমর আলী আশরাফ

৪.লেখক - মুশফিকুর রহমান মিনার, অনলাইন এক্টিভিস্ট http://hillnewsbd.com/category/ মুক্তমত

৫.*মাওলানা আবদুল মতিন,প্রবন্ধ। মাসিক আল-কাউসারের জুমাদাল উখরা ও রজব ১৪২৬ সংখ্যা*

৬.মাওলানা মুফতী যুবায়ের,বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দাঈ,সূত্রঃ পয়গামে সুন্নত ১৪৩১-৩২ হিজরি ।আর্টিকেলটি নেওয়া হয়েছে এই বই থেকে – মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল]